মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৪ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১,মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

শ্রীদেবকুমার বসু

প্রীতিভাজনেষু

১

'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' আখ্যায়িকায়, আমার যাত্রাপথের বিবরণ ও সময়ের কথা বলেছিলাম। এবারও আমার যাত্রা সেই প্রাচীন-তর ইতিহাসের পথে। আমার সন্ধানের লক্ষ্য এক ঐতিহাসিক রানীর ইতিহাসের পথ ও ঐতিহাসিক রানী, এই কথায় কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন। কারণ আমাদের পুরাণ যে আমাদেরই জাতীয় ইতিবৃত্ত, এ বিষয়ে অনেকের সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু আমি দেখেছি, আমাদের প্রাজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ, পুরাণের বিবিধ অলৌকিক আবরণ মুক্ত করে, ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বর্গ যে কোনো আকাশের মহাশূন্যে অবস্থিত স্থান নয়, একান্ত-ভাবেই মানুষের নানা নামের জাতির যাতায়াতের পথেই একটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর প্রাচীন পাদভৌম স্থান, তা এখন আর কারোর অবিদিত থাকা উচিৎ নয়। তবে স্বর্গ স্থানটি ঠিক কোথায় ছিল, অথচ এখন আর সেই নামে স্থানটিকে চিহ্নিত করা হয় না, তা নিয়ে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কিছু বিতর্ক আছে। থাকাই স্বাভাবিক। পুরাণের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কেউ আমাদের ইলাবৃতবর্ষকে স্বর্গ নামে অবহিত করেছেন। ইলাবৃতবর্ষ ছিল দেবতা নামে জাতির মানুষদের বাস। স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে কোনো পণ্ডিত নির্দিষ্ট করেছেন, পূর্ব তুর্কিস্থানের এক বৃহৎ জনপদকে। আবার অন্যত্র অন্য পণ্ডিত স্বর্গের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে, একটি পথের বর্ণনা করেছেন। পঞ্চপাণ্ডব যখন স্বর্গ গমন করেন তখন তাঁরা যে-পথে গিয়েছিলেন, মহাহিমগিরি তাঁদের অতিক্রম করতে হয়েছিল। এই মহাহিমগিরি হচ্ছে হিমালয়। তারপর মহাবালুকার্ণব। এই মহা-

বালুকার্ণব তিব্বতের বিশাল মরুভূমি, গবী। গবী মরুভূমি অতিক্রম করে, তাঁরা মেরু পর্বতে উঠেছিলেন। এই মেরু পর্বতেই, যুধিষ্ঠির ভিন্ন, দ্রৌপদী সহ আর সবাইকে কালগ্রাস করে। এই মেরু পর্বতই বর্তমানের 'আলটাই' পর্বত। এই আলটাই পর্বতের ওপরেই অবস্থিত ছিল স্বর্গ নামক জনপদ। যে-জনপদের অধিবাসীরা জাতিতে ছিলেন দেবতা।

স্বর্গ রাজ্যের যিনি রাজা বা পালক হতেন, তাঁকে বলা হতো ইন্দ্র। স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। অথচ পরিচয়ের দিক থেকে দেবতা আর অসুরগণ ছিলেন বৈমাত্রেয় ভাই। ঋষি কশ্যপের এক পত্নীর নাম অদিতি। এর গর্ভে জন্মে-ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য (আকাশের নয়), ইন্দ্র এবং আরও কেউ কেউ। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মা ছিলেন জ্যেষ্ঠ। ইন্দ্র কনিষ্ঠ। চন্দ্র ছিলেন কশ্যপের খুড়ামহাশয়ের পুত্র, অতএব অদিতির গর্ভজাত সন্তান ব্রহ্মা ইত্যাদিদের তিনি ছিলেন খুল্লতাত।

কশ্যপ আরও একজনকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর নাম দিতি এই দিতির গর্ভজাত সন্তানদের বলা হতো অসুর। অসুরদের গোষ্ঠীকে কেন যে দুর্দান্ত প্রকৃতির বলা হয়েছে, আমি তার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। তবে এই বৈমাত্রেয় ভাইদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো ছিল না। দেবতারা আগে জন্মে-ছিলেন। তাঁরা স্বর্গ নামক সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানটি দখল করে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগোষ্ঠী অসুরদের তাঁরা মোটেই সহ্য করতে পারেন নি। অতএব, নিজেদের প্রবল শক্তির দ্বারা তাঁরা বৈমাত্রেয় ভাইদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। অসুররা বাধ্য হয়েই, চলে গিয়েছিলেন দূরবর্তী 'মন্দ' নামক প্রদেশে। "মন্দ" রাজ্য স্বর্গ থেকে ছিল কিছুটা নিকৃষ্ট প্রকৃতির। অসুররা এটা ভালো মনে মেনে নিতে পারেন নি। স্বর্গ থেকে

বিতাড়িত হয়ে তাঁরা রাগে ফুঁসতেন। আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রায়ই স্বর্গ আক্রমণ করতেন। যুদ্ধে কখনও দেবতাদের জয় হতো। কখনও অসুরদের। অসুররা অনেক সময়েই যুদ্ধে জিতে, স্বর্গে দখল কায়েম রাখতেন।

স্বর্গের দেবতাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মা বাস করতেন, মেরুপর্বত অতিক্রম করে, সেই উত্তর কুরুবর্ষে। আধুনিক কালে সেই কুরুবর্ষ এখন রাশিয়ার সাইবেরিয়া। ব্রহ্মা সেখানে সপারিষদ বাস করতেন বলে, ভারতীয় ইতিহাসের উষালগ্নে সেই স্থানকে সবাই ব্রহ্মালোক বলে জানতো। এই ব্রহ্মা সম্পর্কে আমাদের মনে কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইনি নাকি দেবমানব ও প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা ছিলেন। এটিই হলো ইতিবৃত্তের বিকৃতি। অথবা, ব্রহ্মার জ্ঞান ও দূরদর্শিতার জন্য, তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলে, একটি আবরণ টেনে দেওয়া হয়েছে। আসলে, ব্রহ্মা ছিলেন দেবতাদের সর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। জগৎ সংসার সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশি। তাঁর কাছে বহুত্তর জাতির অধিবাসীরা, নানান সংকটে ও বিপর্যয়ে পরামর্শ নিতে আসতেন।

স্বর্গের থেকেও কুরুবর্ষ ছিল অধিকতর স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে ছ'মাস দিন ছ'মাস রাত্রি। এই কারণে অনেকেই ব্রহ্মলোক সম্পর্কে এক আশ্চর্য কল্পনাময় প্রচার করেছিল। ব্রহ্মালোকের বছর এক দিন ও এক রাত্রি। ব্রহ্মালোক যেন এমনই অলৌকিক স্থান, এবং ব্রহ্মা এমন একজন দেবতা, তাঁর এক বছর এক দিন ও এক রাত্রি।

কিন্তু এ যুগের মানুষ জানেন, সাইবেরিয়াতে ছ'মাস দিন ছ'মাস রাত্রি। আগস্ট সেপ্টেম্বরে যাঁরা রাশিয়ার আধুনিক শহর লেনিন-গ্রাডে যান, তাঁরা রাত্রের অন্ধকার দেখতে পান না। দরজা জানালার পর্দা টাঙিয়ে, ঘরে আলো জ্বেলে, রাত্রি তৈরি করতে হয়।

জ্ঞানই অতীত ও বর্তমানের মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। জ্ঞানই সকল

শক্তির উৎস। আর এই জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হয়েছে বহুবিধ চর্চার দ্বারা। সেই মহাকালের কালবিন্দু গণনার সময়ের আগে থেকে।

ব্রহ্মা তাঁর পারিষদদের নিয়ে সেই জ্ঞানেরই চর্চা করেছেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে, তিনি ছিলেন দীর্ঘজীবি। এখানে আর একটি ঐতিহাসিক সত্যও আমাকে ইতিহাসের ধূলিকণা সরিয়ে জেনে নিতে হচ্ছে। সেই সত্য হলো, কুরুবর্ষে বা ব্রহ্মলোকের যিনি প্রধান ও পালক হতেন, তিনিই ব্রহ্মা নামে পরিচিত হতেন। অতএব, ব্রহ্মাও একজন কেউ ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাসের জীর্ণ পাতার ধুলো উড়িয়ে একটি সন্ধান পাচ্ছি না। স্বর্গে কতোজন ইন্দ্র রাজত্ব করেছিলেন? কতোজন ব্রহ্মা রাজত্ব করেছেন কুরুবর্ষে? তার কোনো হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমাদের পুরাকালে যেভাবে সুতগণ ইতিহাসকে ধরে রাখতেন, তাতে এই হিসাব পাওয়া উচিত ছিল।

আমাকে ইতিহাসের পথ ধরে, আবার একটু পিছনে ফিরতে হচ্ছে। অর্থাৎ স্বর্গ আর দেবতাদের যে-রাজ্য ও রাজত্বের ইতিহাস পেয়েছি, তাকে আবার একটু নতুন করে দেখে নিই। তা হলে, ইতিহাসের যে-লগ্নে, যে-মহারানীর সন্ধানে চলেছি, তার স্থানকালের ভিতটা শক্ত হবে।

স্বর্গলোকে সব মানুষ ও প্রাণীই যাতায়াত করতে পারতো, এ আমি দেখেছি। যদিও স্বর্গলোকের মধ্যে অবস্থিতি করেও, রাজ্যগুলো বিভক্ত হয়ে ছিল, সে জন্য নামও রাখা হয়েছিল আলাদা আলাদা। আর এই রাজ্যগুলোর এক একজন অধিপতি ছিলেন। সেই সব অধিপতিদের যে-নামে পরিচয় পাচ্ছি, আসলে সেগুলো তাঁদের নাম নয়। বরং বলা যায় বংশানুক্রমিক উপাধি।

বহ্মা বা ইন্দ্রের কথা আছে বললেও, আমি আবার নতুন করে

ইতিহাসের পাতাটিকে মেলে ধরি। স্বর্গলোকের বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিরা ছিলেন জাতিতে দেবতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য, যম, চন্দ্র, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ। দেখছি এঁদের প্রধান দেবতা বলা হয়েছে। নামগুলো সবই বংশানুক্রমিক, বা যখনি যিনি নেতা হয়েছেন, তিনিই সেই সব ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করতেন। আর তাঁদের নামানুসারেই রাজ্যের নাম হতো, ব্রহ্মালোক, বিষ্ণুলোক, সূর্যলোক, যমলোক, চন্দ্রলোক। বরুণ কি ছিলেন সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যের অধিপতি? সাগরতলবাসী জলদেবতা হলে, তাঁকে এই গ্রহের নিম্নভাগে দেখতে হয়।

যমও একজন দেবতা। অর্থাৎ দেবতা জাতির মানুষ। যমকে বলা হতো, নিয়মনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইনি ছিলেন সূর্যের পুত্র। সূর্যের দুই পুত্র। যম আর মনু। কিন্তু ইনি সূর্যলোকের কোন্ বা কতো সংখ্যক অধিপতি, ইতিহাসের ধূলাবরণ সরিয়ে, সেই নির্দিষ্টব্যক্তিটিকে খুঁজে পাচ্ছি না। তবে সূর্যের সুয়োরানী আর দুয়োরানীর মধ্যে সুয়োরানীর ছেলে হলেন মনু। দুয়োরানীর ছেলে হলেন যম। এখানেও দেখছি, ইতিহাসের সঙ্গে রূপকথার একটা ক্ষীণ যোগাযোগ রয়েই গিয়েছে। অতএব, সুয়োরানীর ছেলে, মনু পেয়েছিলেন স্বর্গরাজ্যের একটি ভালো অংশ। আর যমের কপালে জুটেছিল, স্বর্গের দক্ষিণ প্রান্তের খুব খারাপ স্থান জলাভূমি। যে-রাজ্যের নাম ছিল নরক।

কিন্তু যম তার জন্য দুঃখিত ছিলেন না। ইতিহাসে দেখছি, তাঁকে বলা হয়েছে পরম ধার্মিক, এবং সুশাসক। তিনিই প্রথম, গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রবর্তন করেছিলেন। সেই থেকে নরকের অধিপতি মাত্রই 'মৃত্যুকারী' বলে পরিচিত হতেন। কিন্তু আধুনিককালে, একশ্রেণীর মিথ্যুক যেমন নরকের পরিকল্পনা করেছে, সেখানে পরলোকগত জীবের পাপ-পুণ্যের দণ্ডদাতা রূপে

যমকে দেখিয়েছে, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই। যম, এবং যম-লোকের অধিপতি সকল যমেরই, মৃত্যু হয়েছে মানুষের মতো। যেহেতু তিনি মৃত্যুদণ্ডের প্রবর্তন করেছিলেন, সেই হেতু তাঁকে ঐভাবে কল্পনা করা হয়েছে। তা ছাড়া, তাঁর রাজ্যের নাম ছিল নরক। নিকৃষ্ট জলাভূমি। সেই কারণেই, অনেকে যমকে নিয়ে নরক গুলজার করেছে।

২

ইতিহাসের এ সকল পাতাগুলো দেখতে হচ্ছে, কারণ, সমস্ত অলৌকিক ও অবাস্তব ব্যাপারগুলো যেন আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করতে পারে। আমার চিন্তাকে জ্ঞানের বাইরে নিয়ে গিয়ে, সত্য দর্শনের বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

রানী বা মহারানী থাক। যাঁকে দর্শন করতে আমার এবারের যাত্রা, তাঁকে আপাততঃ আমি রমণী বলেই উল্লেখ করবো। যে রমণীকে ঘিরে, বহুকাল ধরে মানুষের নানা প্রশ্ন, নানা উক্তি, নানা মন্তব্য, যে-সবের মধ্যে আসল রমণীটি হারিয়ে গিয়েছেন। যাঁর বাস্তব সত্তার ওপর বহুতর কল্পিত আর অলৌকিক সব আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, ইতিহাসের পথ ধরে, সমস্ত কুহেলিকা আর কল্পিত অজ্ঞানতা থেকে তাঁকে আমি দেখবো।

পুরাণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকারদের একটি কথা আমাকে জেনে নিতেই হচ্ছে। সাধারণ মানুষ, সে দেবতা-অসুর-গন্ধর্ব যে জাতিরই হোক, নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের চেতনা ছিল না। অথচ ধর্ম বিষয়ে সকলেরই ছিল বিশ্বাস। ধর্মকে কেন্দ্র করে সমস্ত কিছুকেই তারা শ্রদ্ধা করেছে। যে-কোনো বস্তুকে বংশানুক্রমে পুজো করেছে, রক্ষা করেছে। সেই কারণেই পুরাণ বেদ ইত্যাদির রচয়িতারা সাধারণদের সেই সব রচনাকে ধর্মগ্রন্থরূপে চিহ্নিত করতেন এবং রক্ষা করতে বলতেন। পুরাণের মধ্যে আমাদের যে ইতিবৃত্ত রয়েছে, সাধারণ মানুষ যদি তা ধর্মগ্রন্থরূপে রোজ পূজা ও পাঠ না করতেন, অলৌকিক বস্তু হিসাবে রক্ষা না করতেন, তা হলে আমরা আমাদের প্রাচীন জন্মদাতা ও তাঁদের ইতিহাস

হারিয়ে ফেলতাম। আর সেই কারণেই হয়তো, পরবর্তীকালে অন্যান্য পণ্ডিতদের হাত পড়ে, পুরাণকে সত্যিই অলৌকিক আর অবাস্তব হতে হয়েছে। একশো বছরের আয়ুষ্মান ব্যক্তিকে এক হাজার বছর বা তারও অনেক বেশি বাঁচিয়ে রাখার মিথ্যা দিয়ে, মানুষের মনকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।

স্বর্গলোক অত্যন্ত সুন্দর আর স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল বলেই, অধিবাসীরা দীর্ঘজীবি ছিলেন বলেই, বেদে প্রচারিত দেখছি, স্বর্গলোক্ 'অমৃতভূমি' এবং দেবতারা 'অমর'। তবে ইতিহাসের পাতায় দেখছি, সুমেরু—অর্থাৎ আলটাই পর্বতের সানুদেশে 'দ্যাবা' বা মঙ্গোলিয়া, হিমালয়ের সানুদেশে 'ভূ'—অর্থাৎ পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, মানুষের আদি জন্মভূমি। মঙ্গোলিয়া সমস্ত জীবের প্রথম জন্মভূমি। সেই কারণেই, প্রাচীনতর দেখছি মানবের কাছে, মঙ্গোলিয়া ছিল, 'পিতৃলোক'। আর বৈদিক যুগের মানুষের কাছে ভারত ছিল 'ভূলোক'।

সুদূর অতীতের ইতিহাসের সমস্ত পাতা ঘাঁটতে গেলে যথাস্থানে পৌঁছুতে অনেক বিলম্ব হবে। আর মাত্র দু একটি বিষয় উল্লেখ করে, আমরা গন্তব্যে যাত্রা করবো।

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র 'ধ্রুব' বিমাতার প্ররোচনায় রাজ্যচ্যুত হয়ে, বিষ্ণুলোকের বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁকে কৃপা করে ব্রহ্মলোকে একটি ছোট রাজ্য দান করেন। ধ্রুব সেখানেই সুখেই রাজত্ব করছিলেন। কিন্তু সেই রাজ্য তুষারপাত ও প্রলয়ে ধ্বংস হয়েছিল। কেবল ধ্রুবর রাজ্য নয়, সমগ্র ব্রহ্মলোকই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস হয়েছিল। তখন ব্রহ্মলোকের দেবতারা সকলেই 'সূর্য' অর্থাৎ 'নর সূর্যের' উষ্ণ দেশে আশ্রয় নেন। সূর্যলোক পরিপূর্ণ হয়ে গেলে, দেবতারা যান চন্দ্রলোকে। অর্থাৎ 'নরচন্দ্রের' রাজ্যে।

অনেকে ব্যক্ত করেছেন, প্রাকৃতিক কারণে সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, সবই ধ্বংস হয়েছিল। সেই কারণে দেবতারা সকলেই দক্ষিণে সরে এসে, ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এটাই কি যথার্থ ইতিহাস? না, কি তেত্রিশ কোটি দেবতা অধিবাসীদের পক্ষে আর স্বর্গে স্থান সংকুলান সম্ভব ছিল না বলেই, তাঁরা নিচে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন? ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি যেন এ বাস্তবেরই সাক্ষী দিচ্ছে। যে কারণে, ভারতবাসীদের কাছে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা শোনা যায়।

আমাদের অতীত সম্পর্কে, যে-ভ্রান্তি জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, ইতিহাস তা দূর করার জন্য, আজিও বর্তমান। সেই ইতিহাসের পাতায় দেখছি, দেবতারা দানবদের জয় করছেন। দানবরা দেবতাদের জয় করছেন। কিন্তু নহুষাদির মতো মহা-রাজারাও স্বর্গে গতায়ু হয়েছেন। দেবগণের উপর্যুপরি অনোন্যাতি-শায়িনী দীপ্তশ্রী দর্শনে, স্বর্গেই বা সুখের অস্তিত্ব কোথায়? মানুষ স্বর্গে সমূলে পুণ্যফল ভোগ করে। সেখানে অন্য কর্ম করা হয় না, এটি একটি দোষ। ছিন্নমূল বৃক্ষ যেমন ভূমিতে আছড়ে পড়ে, দেবতারাও তেমনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বর্গে সুখাভিলাষনিষ্ঠ দেবগণেরও সমপ্লবে সহসা দুঃখ উপস্থিত হয়। স্বর্গেও দেবগণের কোনো সৌখ্য নেই। বিবিধাকার ব্যাধিসকল দেবলোকেও লব্ধ-প্রসর। যজ্ঞের শিরোরোগ সর্বদাই বিদ্যমান। ভানুর কুষ্ঠ, বরুণের জলোদর, পুষার দন্তবৈকল্য, ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভন, চন্দ্রের প্রবল ক্ষয়রোগ, দক্ষ প্রজাপতির প্রবল জ্বর, এ সবই দেবতাদের রোগ-নির্দেশ।

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, 'দেব দানব গন্ধর্বদিগকেও মৃত্যু হরণ করে থাকে। মৃত্যুকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।'

ইতিহাসের পথে যাত্রা করে, আমি দেখলাম, এই গ্রহের যা কিছু অতীত ও বর্তমান, তা নানা নামের জাতি মানুষেরই কীর্তি। স্বর্গ

নামক স্থানগুলোতে বাস করতেন, নানা উপাধি নিয়ে দেবতা জাতির মানবরা। আর আমি দেখলাম, মানুষই সূর্য নামে অভিহিত হতেন। চন্দ্র সূর্য বরুণ অগ্নি—অনেক তাঁদের নাম। তাঁদের শৌর্য বীর্য যেমন ছিল, তেমনই ছিল রোগ শোক মৃত্যু। তাঁদের মধ্যে কেউকেউ, তাঁদের কাজের দ্বারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাসের এই সব অধ্যায় আমাকে মনে রাখতে হচ্ছে। কারণ, যে অনন্যা অবিস্মরণীয়া রমণীর সন্ধানে আমার যাত্রা, তাঁকে দর্শন করার দৃষ্টির সকল আচ্ছন্নতা আমার ঘুচে যাবে।

বহু প্রাচীনকালের মানব জাতির যে-ইতিহাসের সামান্য বিবরণের মধ্যে, আমি মরণশীল দেবতাদের দেখা পেয়েছি, তাঁরা যে কাল-প্রভাবে চালিত ছিলেন, স্বয়ং ব্যাসদেব তারই ব্যাখ্যা করেছেন, 'পৃথিবীতেএমন কোনো শক্তি নেই যে, যুগধর্মের প্রভাব প্রতিরোধ করতে পারে। ভাব, অভাব, সুখ, দুঃখ, সকলই কাল-সহকারে ঘটে থাকে। কাল প্রজা সকলকে দগ্ধ করছেন। আবার কালই তাদের শান্ত করছেন। নিখিল ভূমণ্ডলস্থ শুভাশুভ সমুদয় পদার্থ, কাল হতে সৃষ্ট হচ্ছে, কালেতেই লোকসকল লয়প্রাপ্ত হচ্ছে, এবং আবার কাল হতেই উৎপন্ন হচ্ছে। সমগ্র জীব নিদ্রিত হলেও কাল জাগরিত থাকেন। কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। কাল অপ্রতিহত রূপে সর্বভূতেই সমভাবে বিচরণ করছেন। বর্তমান ভূত, ভবিষ্যৎ সকল বস্তুই কাল নির্মিত।'

৩

এই ভূমিকার পরে, এবার আমাদের যাত্রা, যাদবদের রাজ্য মথুরা নগরে। মথুরাপুরীর সেই সময়ে, যখন যাদবদের রাজা শূরসেন রাজত্ব করছেন।

কিন্তু, সহসা দেখছি, মথুরাপুরী যাত্রা আপাততঃ নাস্তি। কারণ, ইতিহাসের যে-সময়ে আমার যাত্রা আসন্ন, সেই মুহূর্তেই মনে হলো, সংহিতা যুগে একবার সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা সেরে নেওয়া উচিত। সংহিতা যুগ আমার ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক ভ্রমণের আবছায়াকে কিছুটা আলোকিত করতে পারে।

সংহতি যুগের একটি বৈশিষ্ট্য দেখছি, আর্যদের জনসংখ্যা খুবই কম। অনার্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লোকক্ষয় হয়েছিল। সেই সময়ে আর্যরা কৃষিকাজকে আয়ত্ত করেছে। নিতান্ত পশুমাংসভোগী, অস্ত্র-ধারী অশ্বারোহী আদিম যাযাবর ছিল না। কৃষি উপযোগী ভূমিরও অভাব ছিল না। অভাব ছিল মানুষের। সমাজের যা কিছু নিয়ন্ত্রণ সবই মানুষের প্রয়োজনে। সংহিতা যুগেও দেখছি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমাজরীতি ও নীতির পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। পরিবর্তনটা প্রধানতঃ নানা রকমের বিবাহ আর পুত্রোৎপাদন পদ্ধতি।

সেই সংহিতা যুগেও বুদ্ধিজীবীরা একটি বিষয় ভালোই জানতেন। পুরুষ-রমণীর পক্ষে রিপু দমন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। আর তার ফলে, রিপু বশীভূত রমণী পুরুষের ফলোৎপাদনক যদি সমাজে যথার্থ রূপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা না যায়, তবে তার পরিণতি শুভ হতে পারে না। এই চিন্তা থেকেই, সমস্ত রকমের দৈহিক

মিলনকে, আর সেই মিলন সম্ভূত সন্তানদের বৈধ করণের জন্য, আট রকমের বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছিল। আর দ্বাদশ প্রকারের সন্তান জন্মকেও সমাজে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

সেইসব বিবাহ পদ্ধতি আর সন্তান ধারণের পদ্ধতির বিবরণে আমি পরে আসছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পন্থাও দেখছি গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন, স্বামী অথবা নিকট সম্পর্কের আত্মীয় আত্মীয়ার নির্দেশ, অনুবর্তন হলো ক্ষেত্রজ সন্তানের। মহাভারতের আদি খণ্ডে দেখছি, স্বায়ম্ভব মনু নির্দেশ করছেন, মানুষেরা নিজের বীর্য ভিন্ন, অন্যের কাছ থেকেও ধর্মফলদায়ক শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভ করতে পারে। কোনো ব্যক্তি কোনো কন্যাকে বিয়ে করার জন্য শুল্ক দিয়ে অনেকদিনের জন্য বিদেশে চলে গেলে, সেই কন্যা শুল্কদাতার উপকার করার জন্যেই, অন্য পুরুষের দ্বারা গর্ভধারণ করে, সন্তানের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু তার জন্যে সেই কন্যাকে নিয়মানুসারে কেউ বিবাহ করতে পারবে না। একমাত্র কন্যার পিতা যদি আগের বরপক্ষকে শুল্ক ফিরিয়ে দেন, তবে কন্যাকে অন্য পাত্রে বিবাহ দিতে পারেন (মহাভারত-অনু)।

কোনো কন্যা কুমারী অবস্থায় পুত্রবতী হলে, পুত্রসহই তার বিবাহের ব্যবস্থা বিধিসম্মত করা হয়, এবং বিবাহিত স্বামীকেই সেই পুত্রকে নিজের ঔরসজাত পুত্রের মতোই লালন পালন অবশ্য কর্তব্য। এটা হলো আসলে কানীন পুত্রকে মেনে নেওয়ারই একটি নির্দেশ। মহাইতিবৃত্ত, মহাভারতের বনপর্বের পাতা খুলে দেখছি, বেদের উল্লেখ করে, স্পষ্টই বলা হয়েছে, অবিবাহিতা রমণীগণ, যাকে ইচ্ছা তাকেই কামনা করতে পারে বলেই তাদের 'কন্যা' বলা হয়। কন্যা হচ্ছে স্বতন্ত্রা। পরতন্ত্রা নয়। স্বেচ্ছানুসারে কাজ করাটাই স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। আর বিবাহাদি নিয়মগুলো, মানুষের শুধু কল্পনা মাত্র। আমি যে-রমণীর সন্ধানে চলেছি, তাঁর সম্পর্কে এখানে একটি বিশেষ

সংকেত পেলাম।

আপাততঃ মহাভারত থেকেই, আমি কিছু নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ঝুলিতে ভরে নিচ্ছি। সেগুলো বিভিন্ন পর্বের থেকে পেয়েছি। পর্ব-গুলোর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যার দরকার, সে যেন 'ভারত' গ্রন্থ দেখে নেয়। যেমন, স্বামীর অবর্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করা বিধেয় ছিল। স্বামীর ভর্তা ধর্মানুসারে ভর্তা হতে পারতেন। অতিথির মনোরঞ্জনার্থে গৃহস্বামিণী আত্মসমর্পণ করতেন। প্রত্যেক রমণীর ঋতু রক্ষা অবশ্য পালনীয়। কোনো রমণী কোনো পুরুষকে ঋতু রক্ষা করতে অনুরোধ করে যদি ব্যর্থ হতো, তবে সেই পুরুষ ভ্রূণহত্যা পাতকের জন্য নিরয়গামী হতো।

তারপরেও দেখছি, অতীতের বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে : রমণী-গণ অনাবৃত ছিল। তারা ইচ্ছামতো গমন ও বিহার করতে পারতো। কারোর অধীনতায় তাদের কালক্ষেপ করতে হতো না। কৌমারাবধি এরা পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে আসক্ত হলেও অধর্ম হতো না। এসব আচরণ ব্যবহার ধর্ম বলে প্রচলিত ছিল। তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই প্রামাণিক ধর্মের সবিশেষ প্রশংসা করতেন।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় হলো, বেদবিৎ মহাত্মারা একথাও বলে গেছেন, ঋতুস্নান থেকে ষোল দিনের মধ্যে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সংসর্গ করলে অধর্ম হয়। ষোল দিন পরে সংসর্গ করলে কোনো অধর্ম হয় না। এর সঙ্গে যে নারী দেহে সন্তানোৎপাদনের একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক কালে, অভিজ্ঞ নরনারী মাত্রেই জানেন, ঋতুস্নানের পর দশদিনের মধ্যে সাধারণত, সন্তান ধারণের জন্য, নারীর ডিম্বাণুটি বেঁচে থাকতে পারে। দশ দিনও অনেক বেশিই গণ্য করা হয়। সাধারণতঃ ঋতুস্নানের পর, নারীর জরায়ুতে আবির্ভূত ডিম্বাণুটি বাহাত্তর ঘণ্টারও সামান্য বেশি কিছু সময় বেঁচে থাকে। সেই সময়ে স্বামী সংসর্গ ঘটলে নারী সন্তানসম্ভবা হয়।

এখানে দেখছি, বেদবিৎ মহাপুরুষরা ঋতুস্নান থেকে ষোল দিন পর্যন্ত, অন্য পুরুষের সংসর্গ নিষেধ করেছেন। যার একটিই মাত্র যুক্তি থাকতে পারে, অন্য পুরুষে সংসর্গ সম্ভব, কিন্তু অন্য পুরুষের সন্তান ধারণ নিষিদ্ধ।

যাইহোক, সমস্ত ব্যাপারগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে, কোনো ক্ষেত্রেই রমণীর সতীত্ব, পদমর্যাদা, সমাজ প্রতিষ্ঠা, কোনো কিছুই ক্ষুণ্ণ বা ম্লান হতো না। অর্থাৎ দৈহিক শুচিতা সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হতো না। এটাই হলো সংহিতা যুগের একটা বৈশিষ্ট্য। সেই যুগে নরনারী নির্বিশেষে সকলের কর্তব্য বলতে বোঝাতো, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, তপ, সত্য, ক্ষমা, অলোভ, অনালস্য, অনসূয়া, ধৈর্য, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সরলতা, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, অপক্ষপাতিত্ব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তিতিক্ষা, অসৎসরতা, ত্যাগ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, শৌর্য, বীর্য, নির্ভিকতা। দৈহিক শুচিতার কথা বিশেষ ভাবে কিছুই নির্দিষ্ট করা ছিল না।

রূপই যে নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ, এটা সেই যুগেও স্বীকৃত ছিল। দ্বিতীয় গুণ, শীল, তৃতীয় সত্য, চতুর্থ সরলতা, পঞ্চম সৎকর্ম, ষষ্ঠ মাধুর্য, সপ্তম অন্তরে বাহিরে শুদ্ধতা, অষ্টম পিতৃভাব, নবম শুশ্রূষা, দশম সহিষ্ণুতা, একাদশ রতি, দ্বাদশ পাতিব্রত্য। পাতিব্রত্যকে যদি সতীত্ব জ্ঞান করি, তা হলে নারীর বিবিধ গুণের মধ্যে এটি হলো দ্বাদশ গুণ।

ভারত ইতিহাসেই, সংহিতা যুগের বিবরণে দেখছি, সেই যুগে রমণীগণ গো-গণের মতো স্বজাতির শত সহস্র পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করলেও, তারা অধর্মে লিপ্ত হতো না। সর্বজনভোগ্য নিত্য ধর্ম বলেই বিবেচিত হতো। কালের প্রভাবে, পরবর্তীকালে, স্ত্রী জাতিকে, গৃহপালিত জীবের ন্যায় কেবল গৃহস্বামী ভোগ্যা রূপে রূপান্তরিত করার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের, পাতা উল্টে দেখছি, "কামশূন্য জীব কখনও জন্মায়নি, জন্মাবে না। এমন কি, জীবন্মুক্ত মহাত্মারাও কামার্ত হলে, প্রতিনিবৃত্তি না।"

ভীষ্ম শরশয্যায় থেকে, কৃষ্ণকে স্তব করতে গিয়ে বলেছিলেন, "যাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় কামময়, যিনি সমস্ত জীবকে কামমদে উন্মত্ত করে থাকেন, সেই কামাত্মাকে নমস্কার।"...

যে-সব প্রাণীর দেহ পঞ্চভূত বিশিষ্ট, তারা সদা কামেরই সাধ্য ও বাধ্য। পঞ্চেন্দ্রিয় কামের আধার। যে-মনুকে নিয়ে আমাদের সমাজে নানা নিষেধ প্রচলিত আছে, দেখছি, সেই মনুও বলছেন, মাংস ভোজন, মদ্য পান, স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে দোষ নেই। এ সব ব্যাপারে জীবদের প্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধই আছে। তবে নিবৃত্ত করতে পারলে মহাফল পাওয়া যায়।

সংহিতার যুগে ফিরে গিয়ে দেখলাম, একটা সময় কাল পর্যন্ত, রমণী জাতির যৌন স্বাধীনতা পুরুষদের মতোই অবাধ আর সমভাব ছিল। কিন্তু কাম প্রবৃত্তির এই অবাধ স্বাধীনতাকে একটা সংহত একমুখী করে তুলতে না পারলে, শৃংখলা রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

অবশ্য মানব সমাজের ইতিহাসে, আমি আধুনিক জ্ঞানীদের কাছে যে-পাঠ পেয়েছি, তাতে দেখেছি, প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই একমাত্র রমণী পুরুষের অবাধ যৌন সম্পর্ক ছিল। রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের, 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গার' মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিত্র দেখেছি। দেখেছি, কারোরই পিতৃপরিচয় ছিল না। মাতৃপরিচয়ও গ্রাহ্য ছিল না। অতএব মা ও কন্যা, একটি পুরুষের সংসর্গ লাভের জন্য, পরস্পর লড়াই করে, একজন, আর একজনকে হত্যা করে, সেই পুরুষকে লাভ করছে। সংহিতা যুগ বলে যে সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা আদি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে, পুরুষরা যখন দৈহিক বলে বলীয়ান হয়ে, নানা রকম সম্পদ আহরণ করতে আরম্ভ করেছিল, সেই সম্পদের দাবীদার কেউ ছিল না। রমণীরা যখন তাদের সন্তানদের জন্য সেই সব সম্পদ দাবী করলো, পুরুষ জিজ্ঞেস করলো, কে তোমার সন্তানের জন্মদাতা? তুমি তো স্বেচ্ছাবিহারিণী। তোমার সন্তানের জন্য আমার সম্পদ্ দাবী করতে হলে, তোমাকে কেবল আমারই অঙ্কশায়িনী হতে হবে।

পুরুষের উৎপাদিত সম্পদ বণ্টনকে কেন্দ্র করেই, বিবাহ প্রথার প্রচলন করতে হয়েছিল। তখনই নারীকে একজন পুরুষের স্ত্রী রূপে বন্দী হতে হলো। কিন্তু পুরুষ কখনও সে-জোয়াল নিজের ঘাড়ে নিল না। সে অন্যান্য রমণীকেও ভোগ করতে লাগলো। এবং সকলের সন্তানকেই তার সম্পদের ভাগীদার হিসাবে মেনে নিল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে, সেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন একদিনে হয় নি, বহুকাল লেগেছিল। এই বিবাহ প্রথার মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাচ্ছি।

সংহিতার যুগেও বিষয়টি বৈজ্ঞানিক বটে। কিন্তু যেহেতু পুরুষের ক্ষমতা, অধিকার, সম্পদ ইত্যাদির কথা ঠিক মতো ব্যক্ত হয় নি, সেই হেতু-ই তাকে আমি অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিতে পারি না। সংহিতা যুগে, রমণী পুরুষের অবাধ যৌন সংসর্গকে, 'দৈহিক শুচিতা' নামে কঠিন লৌহ শৃংখল নাগপাশে আবদ্ধ করে নি। পুরুষজাতি অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় নিজের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। আর তারপরেই যৌন শুচিতার গুণকীর্তন এমন কঠোরতর দেখছি। এর সংরক্ষণের জন্য কঠিন নিয়ম রীতিনীতি তৈরি করা হলো। সেই সব রীতিনীতি না মানলে কঠিন শাস্তির বিধান অসম্মান, অপমানের ব্যবস্থা হলো। শুরু হলো, সংহিতার যুগ অতিক্রম করে, পৌরাণিক যুগের যাত্রা। কিন্তু মনে রাখা উচিত,

সেই অতিক্রমণের সময়টা, দ্বাপর ও কলি যুগের মতোই, প্রায় একশো বছরের কম ছিল না। সামাজিক কোনো পরিবর্তনই অল্প সময়ে হয় না। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আরও বেশি সময়ই লাগতো।

৪

পুরাণের ইতিবৃত্তে এসে দেখছি, দৈহিক শুচিতাই যেন ক্রমে চরিত্রের সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতি ক্রুর স্বভাবাপন্ন নরনারী কোনোক্রমে দৈহিক শুচিতা রক্ষা করতে পারলেই, তারা চরিত্রবান আর চরিত্রবতী হচ্ছে।

সংহিতা যুগে, এ পরিবর্তনের গৌরব বহন করছেন, উদ্দালক ঋষি-পুত্র শ্বেতকেতু। সেই পরিবর্তনকে পরিশোধিত করেছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির ভাইপো, উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা।

সংহিতা যুগে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। তবে ইনি উদ্দালকের ঔরসে বা ক্ষেত্রে জন্মান নি। জন্মেছিলেন পিতার এক শিষ্যের ঔরসে। একদিন তিনি পিতা-মাতার পাশে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে, তাঁর মায়ের হাত ধরে তুলে নিয়ে বললেন, 'চল আমরা যাই।' পিতার সামনেই মাকে একজন তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেখে, শ্বেতকেতু দারুণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। উদ্দালক পুত্রকে সেই অবস্থায় দেখে বললেন, 'বৎস রাগ করো না। এটি হলো নিত্য ধর্ম। এ ভূমণ্ডল মধ্যে সমস্ত রমণীরাই অবারিতা। গো-গণ যে রকম ব্যবহার করে, প্রজাগণও স্ব স্ব বর্ণে সে রকম আচরণ করে থাকে।'

শ্বেতকেতু তা মানতে পারেন নি। তিনি সেই কাল থেকে নিয়ম করে দিয়েছিলেন, এখন থেকে যে রমণী ভর্তাকে অতিক্রম করে ব্যভিচারিণী হবে, তার ঘোর দুঃখদায়ক ভ্রূণহত্যা সদৃশ পাপ হবে। আর যে-পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্যাকে পরস্ত্রী রূপে সম্ভোগ করবে, তারও সেই পাপ হবে। আরও বিধান

দিয়েছিলেন, যে-পত্নী স্বামীর দ্বারা পুত্র লাভে দায়ভাগিনী হয়ে, স্বামীর অবাধ্য হবে, তারও সেই পাপই হবে।

শ্বেতকেতু সেই যুগে দেখছি, পক্ষাপাতশূন্য অনুশাসনই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও পুরুষরা তাঁর বিধান মানতো না। আর শ্বেত-কেতু নিজে যেহেতু ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন, তারও কোনো পরিবর্তন করেন নি।

বেদবিৎ জ্ঞানী জন্মান্ধ দীর্ঘতমা বিদ্যাবলে প্রদ্বেষী নামে এক রূপসী তরুণী ব্রাহ্মণীকে পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন। কয়েকটি সন্তানের জন্ম দেবার পরে, তিনি নিখিল গোধর্ম অধ্যয়ন করে, নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রকাশ্যে মৈথুনাদি করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

আশ্রমবাসী মুনিগণ দীর্ঘতমাকে মর্যাদা অতিক্রম করতে দেখে, রাগ করে তাঁকে আশ্রম থেকে বের করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘতমার পত্নী প্রদ্বেষীও স্বামীর প্রতি পুত্রলাভের জন্য মোটেই তুষ্ট ছিলেন না। একদিন দীর্ঘতমা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেন আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ কর?'

প্রদ্বেষী জবাব দিয়েছিলেন, 'স্বামী তাঁর স্ত্রীর ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলে তাঁকে ভর্তা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তুমি জন্মান্ধ। তার কিছুই করতে পারো না। বরং আমি তোমার ও তোমার সন্তানদের চিরকাল ভরণপোষণ করে অত্যন্ত ক্লান্ত পীড়িত হয়ে পড়েছি। আমি আর তোমার ও তোমার সন্তানদের আগের মতো ভরণপোষণ করতে পারবো না।'

দীর্ঘতমা প্রদ্বেষীর সেই সগর্ব উক্তি শুনে বলেছিলেন, 'আমি আজ থেকে পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করলাম, স্ত্রী জাতিকে যাব-জ্জীবন কেবল মাত্র স্বামীর অধীন হয়ে থাকতে হবে। স্বামী বেঁচে থাকলে, বা মারা গেলেও, স্ত্রী পুরুষান্তর ভজনা করলে, তিনি অবশ্যই পতিত হবেন। আর পতিহীনা নারীদের প্রচুর সমৃদ্ধি

থাকলেও, তা ভোগ করতে পারবে না। ভোগ করলে, অকীর্তি ও পরিবাদের সীমা থাকবে না।'

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারী নিজের চোখ সান্দ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখতেন, কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, স্বামীর প্রতি কখনও অশ্রদ্ধা বা অসূয়া প্রকাশ করবো না। কিন্তু প্রদ্বেষী চোখ আবৃত না করায়, তিনি স্বামীর প্রকাশ্য ব্যভিচার দর্শনে অসূয়া প্রকাশ করেছিলেন।

গান্ধারী একবার মাত্র গর্ভধারণ করেছিলেন। আমি এবারের ইতিহাস পরিক্রমায়, গান্ধারীর গর্ভধারণ বিষয় দিয়ে কোনো দিগন্ত উন্মোচিত করবো না। তবে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সেবায় নিযুক্তা, এক বৈশ্যা দাসীর গর্ভে যুযুৎসু নামে একটি পুত্রোৎপাদন করেছিলেন। এবং করণ নামে তাঁর আরও একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। সংহতি যুগ থেকে, পুরাণের যুগ শুরু হওয়ার স্তরে আমি পৌঁছেছি। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত রচনাকাল ঠিক কোন্ সময়ে হয়েছিল? একটা বিষয়ে সন্দেহ নেই, ইতিহাস নির্দেশ করছে, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিতে, একশো বছরের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। এক্ষেত্রে রামায়ণ রচনার সময় সম্বন্ধে নানা রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পণ্ডিত-দের মধ্যে বর্তমান।

ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় একটি নির্দিষ্ট সূত্র সন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রামায়ণ ও মহাভারত, এ দুটিই কি ইতিহাস? অথবা রামায়ণ কাব্য মাত্র? আমি ইতিহাসের যে পথ পরিক্রমায় যাত্রা করেছি, দেখেছি, রামায়ণও ভারতের ইতিবৃত্তের মধ্যেই গণ্য হয়। এবং রামায়ণ-মহাভারত, একাধারে মহাকাব্য ও ভারতের ইতিবৃত্তও বটে।

রামায়ণ-মহাভারতের রচনাকালের সঙ্গে, সংহিতা যুগের ব্যবধান কতটা? ইতিহাসের পাতায়, ধুলাস্তর সরিয়ে আমি দ্বাপর ও

পুরাণের কালের যে ঐতিহাসিক সময়ের সন্ধান পাচ্ছি, সংহিতা যুগের সন্ধান সেখানে পাচ্ছি না। দ্বাপর যুগকে সংহিতার সঙ্গে এক অর্থে ধরা যায় না। তবে মহাভারত যেমন পুরাণ এবং একই সঙ্গে পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত হয়, আমার ইতিহাস পরিক্রমা, সেই মহাভারত রচনারও পূর্বে।

পণ্ডিতবর্গ কিছু ঘটনা ও নিয়ম-নীতি প্রচলনের শুরুর সময়কেই সংহিতাযুগ বলে বর্ণনা করেছেন। সে-বর্ণনা আমি আগেই দিয়ে এসেছি। আধুনিক চিন্তায় যদি এই রকম ব্যাখ্যা করা যায়. নর-নারীর প্রাক্‌বিবাহ, এবং বিবাহের যুগের শুরুকেই সংহিতা যুগ বলা যায়, তা হলে দ্বাপরের সঙ্গে সংহিতা যুগের একটা সমসাময়িকতা নির্ধারিত করা যেতে পারে।

সংহিতার অভিধানগত অর্থ কী? সংগৃহীত রচনাসমূহ, সংকলন গ্রন্থ, বেদের মন্ত্রসমষ্টি, মন্ত্রাদিকৃত স্মৃতিশাস্ত্র, পবিত্র ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশসমূহ বা গ্রন্থ, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি। (সংসদ বাংলা অভিধান।) এই একই অভিধানের, 'যুগ'-এর অর্থ দেখছি, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই চার পৌরাণিক কাল। কিন্তু সংহিতা যুগ বলে নির্দিষ্ট কোনো যুগকে চিহ্নিত করা হয় নি। তবে সংহিতা বলতে 'পবিত্র ও অবশ্যপালনীয় নির্দেশসমূহ বা গ্রন্থ' — এই কথার সঙ্গে সংহিতা যুগের একটা সম্পর্ক যেন পাওয়া যাচ্ছে। তা হলে, দ্বাপরের সঙ্গে সমসাময়িকতার নির্ধারণ আর করা যায় না। কারণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, সংহিতা যুগেরও পরের কাল। সংহিতা আর পৌরাণিক কালকে পণ্ডিতরা আলাদা করে দেখিয়েছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, পৌরাণিক কাল।

এই পৌরাণিক কালের, দ্বাপরের একেবারে শেষ দিকেই আমার যাত্রা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও আগে। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক-পক্ষের নায়কগণ, পঞ্চপাণ্ডবের জন্মেরও আগের কালে আমাকে

বিচরণ করতে হবে। আমাকে প্রথম যেতে হবে, যদুবংশের রাজা শূরের আমলে। ইনি পৃথার জনক। আর সেই পৃথা নাম্নী কন্যার উদ্দেশ্যেই আমি চলেছি।

যদুবংশের রাজা শূরের সময় যে দ্বাপর যুগ চলছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাচ্ছি না একটি হিসাব। এক একটি পৌরাণিক কালের আয়ু কত বৎসর? বলা হয়ে থাকে, এখনও এই গৃহে কলিযুগ চলছে। তা যদি হয়, তাহলে কলিযুগ কোন্ সময়ে শুরু হয়েছিল, সেই হিসাবটি পেলে, বর্তমানে কলিযুগের বয়স নিরূপণ করা সম্ভব।

ইতিহাসের পথপরিক্রমায় দেখছি, কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর যখন অতীত হয়েছিল তখন শকাব্দ আরম্ভ হয়েছিল। শকাব্দের হিসাবটা আমরা জানি। এখন এই ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে, শকাব্দ হলো ১৯০৭। তাহলে, কলি—অর্থাৎ কল্যব্দের ৩১৭৯-এর সঙ্গে ১৯০৭ যোগ করলে দাঁড়ায় ৫০৮৬ কল্যব্দ। তার অর্থ, পাঁচ হাজার ছিয়াশি বছর আগে কলিযুগের শুরু হয়েছিল। বর্তমান সময়কেও, কলিযুগই বলা হয়। কলির বয়সই এখন যদি পাঁচ হাজার ছিয়াশি বৎসর চলতে থাকে, তবে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের বয়স কত হয়েছিল? ইতিহাসের পাতার ধুলো সরিয়ে, সে-হিসাব আমি উদ্ধার করতে পারছি না। না পারলেও ক্ষতি নেই। আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছি, আপাততঃ আমার যাত্রা দ্বাপরের অন্তিম সময়ে। দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যবর্তী একশো বৎসরের অনধিক সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। সংখ্যাহনাদেশে শতম্। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকলে, শত সংখ্যা ধরতে হয়। সেই হিসাবে, দ্বাপরের শেষ পঞ্চাশ, কলির প্রথম পঞ্চাশ, এই একশো বছরকে দ্বাপর ও কলির অন্তরকাল বলে ধরা যেতে পারে। সেই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময়

থেকে, আজ পর্যন্ত ভারতে একটা কথা প্রচলিত আছে, দ্বাপরের শেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল।

এ যুদ্ধের অনেক আগেই পৃথার জন্ম। যদুবংশের রাজা শূরের রাজ্য ছিল মথুরায়। কৃষ্ণ তখন কোথায়? কৃষ্ণের জন্ম নিয়েও, সেই আবার দ্বাপর কলির সন্ধিক্ষণের সময়ের কথাই আসছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়, কৃষ্ণের বয়স কত? বয়সের বিচারে কৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের থেকে এক বছরের ছোট। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়, যুধিষ্ঠিরের বয়স ৭২, ভীমের ৭১, অর্জুনের ৭০। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের বয়স ৬৯ ধরতে হয়। কিন্তু তিনি কলিযুগে জন্মেছিলেন? ইতিহাসের হিসাবে দেখছি, না। প্রথমতঃ কৃষ্ণকে সেই সময়ে বলা হচ্ছে কর্মপ্রবর্তক। ধর্মপ্রবর্তক বলতে, অনেকেই বিষয়টিকে একটি সীমাবদ্ধতার মধ্যে রেখে দিতে চান। যাঁরা চান, তাঁদের বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। ধর্মপ্রবর্তক বলতে বোঝায়, প্রকৃত নীতি ধর্মের প্রচারক। কৃষ্ণ সেই অর্থে, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, কূটনীতি, সমস্ত বিষয়েই ছিলেন অতি প্রতিভাধর, দূরদর্শী ব্যক্তি। তাঁর সময়ে তাঁর মতো যে-কোনো বিষয়ে, নীতি নির্ধারক আর কেউ ছিলেন না। যদুবংশকে রক্ষা থেকে, পাণ্ডবদের যথাযোগ্য পরিচয় ও উত্থানের নেতৃত্ব, জরাসন্ধ বধ, প্রাগজ্যোতিষপুর জয়, বহু বিষয়েই তিনি এমন সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার জনক, সাধারণ মানুষ তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান রূপে পুজো করেছে। তাঁর থেকে যাঁরা বয়সে অনেক বড় ছিলেন, ভীষ্ম, বেদব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, গান্ধারী, সকলেই তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ প্রার্থনা করতেন।

কলিকে বলা হয় পাপ প্রবর্তক। অতএব, কৃষ্ণ যতোক্ষণ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততোক্ষণ কলি প্রবেশ করতে পারে নি। এক্ষেত্রে দেখছি 'অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন, ভরণীনক্ষত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। পরবর্তী আমাবস্যার দিন দুপুর-

বেলা রাজা শল্য, আর সন্ধ্যাবেলা কুরুরাজ দুর্যোধন যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তাহলে মুখ্য চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যাতে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। তার পরদিনই পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছিলেন, আর সেদিন থেকেই যুধিষ্ঠিরাব্দ শুরু হয়েছিল। আর সেই পৌষ মাসের শুক্লপ্রতিপদ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন পরে মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ আরম্ভ হয়েছিল। অর্থাৎ কল্যব্দের শুরু হয়েছিল।

৫

কৃষ্ণের জন্ম তাহলে দ্বাপরেই। কিন্তু পাপপ্রবর্তক কলি, কৃষ্ণ বর্তমান থাকতে প্রবেশ করতে পারে না, এমন কথা আমি শুনেছি। অথচ হিসাবে মিলছে না। মৌষল পর্বে দেখছি, যুধিষ্ঠির যুদ্ধজয়ের পর ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কৃষ্ণ সেই বছরেই মহাপ্রয়াণ করেন। তাহলে কলিকে আটকানো গেল কোথায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষদিন থেকে, পঁয়তাল্লিশ দিনে, মাঘী পূর্ণিমায় কলি প্রবেশ করেছিল। তার ছত্রিশ বছর পরে যদি কৃষ্ণ গত হন, তখন কলির প্রবেশ ঘটে গেছে।

এখানে তৎকালীন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তব্য হলো, এ কথা ঠিক যে, কৃষ্ণ বেঁচে থাকতেই কলি দ্বাপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কৃষ্ণ বিদ্যমান থাকায়, কলি তার নিজের প্রভাব আদৌ বিস্তার করতে পারে নি। এই কারণেই শ্রীমদভাগবত প্রভৃতি, কলির প্রভাব ব্যক্ত করাকেই কলির প্রবেশ বলেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সভ্যতায়, কৃষ্ণ যে কলিযুগেই গত হয়েছিলেন, সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে।

এই পরিক্রমার কারণ দুটি। এক পৃথার জন্ম সময়ে যাওয়া। এবং পৃথার জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, তার সামাজিক মূল্যায়ন। সামাজিক মূল্যায়ন ব্যতীত, পৃথা, তথা কুন্তীর জীবনের সমস্ত ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব না। পুরাণ ও পুরাণের নায়ক-নায়িকাদের যখন আমি ইতিবৃত্ত, ঐতিহাসিক চরিত্র বলেই বিশ্বাস করেছি, অতএব সে সময়ের ঘটনাকে ও নায়ক-নায়িকাদের আমি কোনো রকম অযৌক্তিক, অলৌকিক ভাবে উপস্থিত করতে পারি নি।

রামায়ণে সীতার দেহ-শুচিতা নিয়ে যে-সব প্রশ্ন উঠেছিল, যে কারণে সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, গর্ভবতী অবস্থায় বনবাসে যেতে হয়েছিল তারপরেও পাতাল প্রবেশ করে তাঁকে সতীত্বের প্রমাণ দিতে হয়েছিল। স্বভাবতঃই মনে হয়, সংহিতার যুগের অনেক পরে এ ঘটনা ঘটেছিল। কারণ সংহিতা যুগে নরনারীর অবাধ যৌন মিলনকে, নিত্য, অর্থাৎ চিরকালীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং তার মধ্যে কোনো দোষ ছিল না। কেবল একটি বিষয়ে নির্দিষ্ট ছিল, মিলিত নরনারীদের হতে হবে স্বজাতি। যে কারণে গো-জাতির সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলা হয়েছে, গো-গণ যেমন নিজেদের মধ্যে যদৃচ্ছা মৈথুনাদি ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে পারে, মানুষও তাদের স্বজাতি-দের মধ্যে সেই রকমই লিপ্ত হতে পারে।

তা হলে কি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি, এই চার পৌরাণিক কালই সংহিতা যুগের পরবর্তীকাল ? ইতিহাসের ধুলাচ্ছন্ন পাতায়, তার কোনো হদিস পাচ্ছি না। অথচ সংহিতা যুগে নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক যা প্রচলিত ছিল, দ্বাপরেও তার কিছু অবশিষ্ট আছে দেখছি। যদিও সংহিতা যুগেই নরনারীর অবাধ মিলনের বিরুদ্ধে শ্বেতকেতু এবং দীর্ঘতম নতুন নীতির প্রচলন করে গিয়েছিলেন। তা হলে, সত্য আর ত্রেতায় কী এই প্রথা প্রচলিত ছিল ? যদি ধরে নিতেই হয়, সত্য আর ত্রেতা, সংহিতা যুগের পর পৌরাণিক কাল। পণ্ডিতবর্গও সেই হিসাবই দিয়েছেন, সংহিতা যুগের পর পৌরাণিক কালের শুরু।

সীতাকে তো চিরকাল ধরে সত্য যুগের মানবীই বলা হয়েছে। সত্যযুগ ছাড়া অমন সতীর আবির্ভাব ছিল অসম্ভব। আবার যে পঞ্চ কন্যার এক কন্যার সময়েই আমার যাত্রা, সেই পৃথারও আগে নিশ্চয়ই গৌতম পত্নী অহল্যার ঘটনা ঘটেছিল। অহল্যার ঘটনা ঘটেছিল রামায়ণের যুগে। পঞ্চ কন্যার আর একজন হলেন মন্দোদরী।

তিনিও রামায়ণ যুগেরই মহিলা।

পৌরাণিক কালকে এই ভারতের মানুষ নামক জাতির, কাল বিভাগকেই বলা যায়। স্বর্গবাসী দেবতা জাতির সেরকম কোনো ইতিবৃত্ত আমরা পাই না। মানুষের ইতিবৃত্তের ঘটনা বিশেষে, দেবতাদের এই ভারত-ভূমিতে আগমন ঘটেছে। বা মানুষকে কোনো কারণে স্বর্গে যেতে হয়েছে কোনো কাজে। তখন স্বর্গ ও দেবতার সম্পর্কে আমরা কিছু সংবাদ পাই। যেমন অর্জুন স্বর্গে গিয়ে পাঁচ বছর ইন্দ্রের কাছে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন।

কিন্তু কোন্ ইন্দ্র, তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। কারণ ইতিহাসের পাতায় স্পষ্টতঃই দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ নামক স্থানে যিনি রাজা বা প্রধান ছিলেন, তাঁকেই ইন্দ্র বলা হতো। অর্থাৎ রাজা। স্বর্গের পালক এবং শাসকদের মধ্যে, যুগে যুগে একাধিক ইন্দ্র ছিলেন। যেমন আমরা আগেই দেখে এসেছি, স্বর্গের আরও বিভিন্ন রাজ্যের অধি-পতিদের, ইন্দ্রের মতোই, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো। বলা-বাহুল্য সে-সব সূর্য ইত্যাদিও বংশগত বা যিনি রাজ্যের অধিপতি হতেন, তাঁকেই বলা হতো। দেবতা জাতিও মানুষই ছিলেন।

যাই হোক, পঞ্চ কন্যার মধ্যে চারজনই ছিলেন এই ভারতের রমণী। একমাত্র বৃহস্পতি পত্নী তারাকেই মনে হচ্ছে স্বর্গবাসিনী। অনেকে তারাকে রামায়ণের বালীর পত্নী মনে করেন। বস্তুতপক্ষে তা নয়। ইনি সুর গুরু বৃহস্পতির অতি সুন্দরী পত্নী তারা। সুর মানেই দেবতা। অর্থাৎ স্বর্গবাসী। চন্দ্র তিনি, যে চন্দ্রই হোন, স্বর্গেরই কোনো রাজ্যের কোনো এক অধিপতি, যাঁদের রাজপদবীই ছিল চন্দ্র, এমনই একজন তারাকে বলাৎকার করেছিলেন। এই চন্দ্র যে একজন মানুষ রাজা ছিলেন, তা তারার অভিশাপের কথাতেই জানা যায়, "ওরে মূর্খ! তুই রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া আপনাকে বলবান

বিবেচনা করিতেছিস" ইত্যাদি।

চন্দ্র অবশ্য কোনো কথাই শোনবার পাত্র ছিলেন না। নিজের সুন্দর রথে যেতে যেতে সুন্দরী তারাকে দেখে রথে তুলে বলপূর্বক রমণ করতে লাগলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি বার বার স্ত্রীকে প্রার্থনা করলেনও, মদমোহিত চন্দ্র কিছুতেই তারাকে পরিত্যাগ করলেন না। ফলে তারার উপলক্ষ্যে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লেগে গিয়েছিল প্রচণ্ড বিবাদ। বৃহস্পতির ওপর অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য কোনো কালেই খুশি ছিলেন না। ফলে তিনি চন্দ্রের পক্ষ নিয়েছিলেন।

যাই হোক, তারার ঘটনা আমার বিষয় না। গর্ভিণী তারা সুন্দর একটি পুত্র জন্ম দিয়ে, সত্য কথা প্রকাশ করেছিলেন, চন্দ্রের ঔরসেই তিনি গর্ভধারণ করেছিলেন। একটি পুত্রের জন্ম রহস্য যে তিনি সকল মূল্যবোধের ওপর স্থান দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, সেই কারণেই তৎকালে তাঁকে সকলে ধন্য ধন্য করেছিলেন।

'তারা'র ঘটনা স্বর্গের এটাই প্রমাণ হলো। এবং সময়ের কোনো নির্দেশ না থাকলেও স্বর্গেও যে নারীর দেহ-শুচিতার বিষয়টি ছিল তারার ঘটনায় তা জানা যায়। ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় কন্যাদের সঙ্গে, স্বর্গবাসী দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার নাম যে কেন যুক্ত করা হয়েছিল, তা বোধগম্য হচ্ছে না।

তারা-র যুগ নিরূপণ সম্ভব হলো না। মন্দোদরী ও অহল্যা রামায়ণের যুগের নারী। কুন্তী ও দ্রৌপদী মহাভারতের যুগের। আমার যাত্রা কুন্তীর জন্মলগ্নে অর্থাৎ পৃথার। পৃথার জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটেছে সেই সব ঘটনার সঙ্গে যুগ ও কালের মহিমা একান্ত ভাবে যুক্ত। সেই সঙ্গে সকলপ্রকার অলৌকিক অবাস্তবকে প্রক্ষিপ্ত আবর্জনার ন্যায় ত্যাগ করা বিধেয় বলে মনে করি।

কোনো কোনো পণ্ডিতবর্গের বিশ্বাস বা ধারণা, রামায়ণ আর মহাভারত রচিত হয়েছিল, সংহিতা যুগ ও পৌরাণিক যুগের সন্ধি-স্থলে। এই ধারণাটি খুবই বিভ্রান্তিকর। এই ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে, কলি যুগ চলছে পাঁচ হাজার ছিয়াশি বৎসর। কলির নামানুসারেই কল্যব্দ সৃষ্টি হয়েছিল। এই কল্যব্দ শুরু হবার কিছু আগে বা সেই বৎসরই কিংবা তার সামান্য কিছু কাল পরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধের আগে, আরও দুটি পৌরাণিক কাল গত হয়েছিল। সত্য ও ত্রেতা। অতঃপর, সংহিতায় ও পৌরাণিক যুগের সন্ধিস্থলে রামায়ণ-মহাভারত রচিত হয়েছিল, এ-যুক্তি টেঁকে না।

সত্যযুগই যদি পৌরাণিক কালের আদি হয়, তা হলে, সংহিতাযুগ ও সত্যযুগের সন্ধিস্থলে কী করেই বা রামায়ণ-মহাভারত রচিত হতে পারে! মহাভারতের আদি পর্বে, প্রথম অধ্যায়, ৫৮ শ্লোকের বক্তব্য হলো, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর জন্মে, বৃদ্ধ হয়ে স্বর্গবাস করলে, মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেছিলেন। ইতিহাসের এক পর্বে দেখছি, স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে, পরীক্ষিতের মৃত্যুর পরে, জনমেজয়ের সর্পসত্রের পর্বে, প্রকৃত মহাভারত রচিত হয়েছিল!

জনমেজয়ের নিকট প্রকৃত মহাভারত বলার পরে, অন্য কোনো ঋষি অথবা স্বয়ং বেদব্যাসই সমগ্র উপাখ্যানটি সুসংলগ্ন করবার জন্য, প্রস্তাবনা ভাগ রচনা করে, প্রকৃত মহাভারতের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন। তারপরে আরও পরিষ্কার করে, ঐতিহাসিক আমার সামনে তুলে ধরছেন, ৬১ কল্যব্দে বেদব্যাস মহাভারত

রচনা আরম্ভ করেন, এবং তিন বছরে তা শেষ করেন।
কোনো সন্দেহ নেই, বেদব্যাস দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন কিন্তু ইতিহাস আমাকে ক্রমেই নানা বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। দেখছি, বেদব্যাসও একজন ছিলেন না। বেদকে অনেকেই নানা ভাবে ভাগ করেছিলেন। এবং তাঁরা সকলেই বেদব্যাস নামে পরিচিত হয়েছিলেন।
যদি তা মেনে নিই, তা হলেও, সেই বেদব্যাসরা তো কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব ছিলেন না। মহাভারত রচয়িতাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বলা হয়েছে, এবং তিনি যে সত্যবতীর গর্ভে, পরাশরের ঔরসজাত কানীনপুত্র, তারও উল্লেখ আছে। অতএব অন্যান্য বেদব্যাসকে মহাভারতের রচয়িতা বলে মেনে নিতে আমার স্বভাবতঃই অসুবিধা হচ্ছে।
বেদব্যাসের জন্ম দ্বাপর যুগে হয়েছিল, এটিই সর্ববাদী-সম্মত হওয়া উচিত। ইনি পরাশরের পুত্র। অর্থাৎ সত্যবতীর কানীনপুত্র। এঁর থেকে ভীষ্ম বয়সে কতো ছোট ছিলেন, যথার্থ হিসাব পাওয়া যায় না। ভীষ্ম ছিলেন শান্তনুর ঔরসজাত গঙ্গার পুত্র। তারপর শান্তনু সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হন, এবং তাঁকে বিয়ে করতে চান। সত্যবতী একটি শর্তে বিয়ে করেছিলেন। ভীষ্ম বা তাঁর পুত্র বা তাঁর বংশধর কেউ শান্তনুর সিংহাসনের দাবীদার হবেন না।
ভীষ্ম যখন দেখেছিলেন, পিতা শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহার্থে অতি মাত্রায় আকাঙ্ক্ষা করছেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিবাহও করবেন না। সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্যের বিধবা দুই পত্নীর গর্ভে, সন্তান উৎপাদনের জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করেছিলেন। ভীষ্ম তাঁর প্রতিজ্ঞামতো, অসম্মত হন। তখন সত্যবতী তাঁর কন্যকাবস্থা-জাত পুত্র বেদব্যাসকে ডেকে, অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্র উৎপাদনের আদেশ করেন। সেই বেদব্যাসের ঔরসেই, বিধবাদের

গর্ভে, সত্যবতী ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করান। পুত্রদ্বয় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু।

ইতিহাসের এ-প্রসঙ্গ অনেকেরই জানা। কিন্তু বেদব্যাস কানীনপুত্র হওয়া সত্ত্বেও ভীষ্ম তাঁকে উদ্দেশ্য করে কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। এটি দ্বাপরযুগের ঘটনা কোনো সন্দেহ নেই। আর এই যুগেই দেখতে পাচ্ছি, ভীষ্ম ও বেদব্যাস দুই ভাই হওয়া সত্ত্বেও, এঁদের পিতা ও মাতা আলাদা। এরকম একটা সম্পর্ক সেই যুগেই সম্ভব দেখছি। সম্পর্কে দুই ভাই, অথচ দুজনেব পিতা-মাতা ভিন্ন। পরাশর মুনির ঔরসে, কন্যা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম। শান্তনুর ঔরসে, গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্ম। পরে যেহেতু শান্তনু সত্যবতীকে বিয়ে করলেন, তখন স্বভাবতই ভীষ্ম ও বেদব্যাস পরস্পর ভাই হলেন।

আপাততঃ যে-উদ্দেশ্যে আমি বেদব্যাসের প্রতি ভীষ্মের শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা বললাম, সেটার কারণ দেখি। বেদব্যাসে জন্ম-রহস্যের কথা, ভীষ্ম সত্যবতীর কাছ থেকেই শুনেছিলেন, শুনেও তিনি সেই কানীনপুত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। এতে প্রমাণ হয়, ভীষ্ম কানীনপুত্রের প্রতি কোনোরকম ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেন নি। অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় দেখছি, এই ভীষ্মই শরশয্যা থেকে কর্ণের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক উক্তি করছেন, 'ধর্মলোপে জন্ম'।

ব্যাসদেবকে প্রথম দর্শনের সময়, ভীষ্ম যৌবনের প্রান্তে এসে পৌঁছে-ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু বড় হয়েছিলেন। তাঁদের পুত্রগণ, কুরুপাণ্ডবে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় পঞ্চপাণ্ডবে এবং কৃষ্ণের বয়সের কথা আমি আগেই বলেছি। তাহলে এখন এই সিদ্ধান্তেই ইতিহাসের অনিবার্য গতি দেখছি, ব্যাসদেব ও ভীষ্মের সাক্ষাতের, অন্ততঃ সামান্য কম বেশি, প্রায় একশো বছর

পরে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধের সময় ভীষ্ম শরশয্যা শুয়ে, কানীনপুত্র কর্ণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি করে বলেছিলেন 'ধর্মলোপে জন্ম।' অথচ একশো বছর আগে, বেদব্যাস যে কানীন পুত্র, তা জেনেও, তাঁকে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। আর কর্ণের সম্পর্কে ঐরকম উক্তি। তবে কি, একশো বছরের মধ্যেই, কানীনপুত্র সম্পর্কে সমাজে নতুন চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল ?

সমাজ পরিবর্তনের ঘটনাটি যদি সেই সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে, তবে সংহিতা ও পৌরাণিক কালের সন্ধিস্থলের প্রসঙ্গ আসবে কেন ? দ্বাপরেরও আগে, সত্য ও ত্রেতা অতিক্রম করেছিল। আর, বস্তুতপক্ষে যা দেখছি, মহাভারতের রচনাকাল তো কলিযুগে। তখন দ্বাপরও অতিক্রান্ত। যে-পণ্ডিত রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকাল, সংহিতা যুগ ও পৌরাণিক যুগের সন্ধিস্থল কল্পনা করেছেন, তিনি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। কারণ, তিনি আবার কিছু ঘটনার উল্লেখ করে, রামায়ণের রচনাকাল স্থির করেন, মহাভারতের ষাট বছর আগে। পরে আবার দাশরথি রামের (রাজা দশরথের পুত্র রাম। ইনি ব্যতিরেকেও আরও রাম ছিলেন) বংশ তালিকা বিচার করে, আর একটি মতামত প্রকাশ করছেন। সেই বিচারে দেখা যাচ্ছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কম করে পাঁচশো বছর আগে, লঙ্কা যুদ্ধে রাবণ নিহত হয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পাঁচশো বছর আগে, লঙ্কা যুদ্ধে রাবণ নিহত হয়েছিলেন, এই হিসাবে আসতে, এক ইতিহাসবেত্তাকে, রামের বংশ তালিকা বিচারের দ্বারা, রামের তেত্রিশ পুরুষ পরে, তাঁর বংশের বিশ্রুতবানের পুত্র বৃহদ্বলকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু বধ করেছিলেন। (মহাভারতের দ্রোণ পর্ব, ৪৭ অধ্যায় থেকে এই হিসাব পাওয়া যাচ্ছে।)

আবার অন্য এক সূত্রে, অবগত হচ্ছি, গৌতম পুত্র শতানন্দ জনক

রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। তিনি রামের সঙ্গে সীতার বিয়েতে পৌরোহিত্য করেন। শতানন্দের পৌত্র ও পৌত্রী, যমজ কৃপ ও কৃপী ছেলেবেলা থেকেই, রাজা শান্তনুর কাছে মানুষ হন। পরে পাণ্ডবগণের কুরু ও পাণ্ডব কুমারদের আচার্য দ্রোণের সঙ্গে কৃপীর বিয়ে হয়।

লঙ্কার রাজা রাবণের মহিষী মন্দোদরী ময়দানবের কন্যা। এই ময়দানবই যুধিষ্ঠিরের জন্য ত্রিভুবন বিখ্যাত মণিময়ী সভাস্থল নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

ধর্মাত্মা ভীষ্মের সঙ্গে, অদ্ভুত দর্শন ঋষিসত্তম পুলস্ত্যের দেখা হয়। এই পুলস্ত্য ছিলেন রাবণের পিতা। ভীষ্মের অনুরোধে, এই পুলস্ত্য তীর্থ সমুদয়ের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করে শোনান।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, যথাক্রমে পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণে দিগ্বিজয়ে গমন করেন। মহীস্মতী নগরে সহদেবের সঙ্গে রামানুচর নীলরাজের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তারপর সহদেব সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হয়ে পুলস্ত্য পুত্র বিভীষণের নিকট প্রীতিপূর্বক দূতাদি প্রেরণ করেন। তার প্রতিদানে বিভীষণও প্রীতিপূর্বক সহদেবকে বহু মূল্যবান বস্ত্র মণি সকল প্রেরণ করে, তাঁর শাসন গ্রহণ করেন।

ওপরে বর্ণিত ঘটনাসমূহ থেকেই, পণ্ডিতমহাশয়, প্রথমে এরকম একটি ধারণায় পৌঁছেছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কমপক্ষে যাট বছর আগে বা তার কাছাকাছি কোনো সময়ে রামায়ণ রচিত হয়েছিল। রামায়ণ রচনা ও লঙ্কা যুদ্ধে রাবণের বিনাশ, এক কথা না। বাল্মীকির আশ্রমে যদিও সীতা তাঁর দুই পুত্র লব ও কুশকে জন্ম দিয়েছিলেন, ঠিক তার কতোকাল পরে রামায়ণ লিখিত হয়েছিল, সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন থেকেই যায়। লব-কুশ রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া আটকেছিল। পরে বাল্মীকি লব-কুশকে নিয়ে রামের সভায় যান।

সেখানে রামায়ণ কাহিনী গান গেয়ে শোনানো হয়েছিল, এমনটি মনে হয় না। তবে, সীতার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই, বাল্মীকির কবিসত্তা যে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাল্মীকি ছিলেন কবি, প্রেমিক।

যাই হোক, গৌতমপুত্র শতানন্দ জনকরাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। কোন্ গৌতম? পুরাণের ইতিবৃত্তে একাধিক গৌতমকে পাওয়া যায়। সংহিতা যুগের দীর্ঘতমাকেও পরে গৌতম নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু মুশকিল লাগে, যখন দেখি, শতানন্দর পৌত্র ও পৌত্রী কৃপ ও কৃপী রাজা শান্তনুর রাজগৃহে ছেলেবেলা থেকে বড় হয়েছেন, তখন বুঝতে পারি, এর মধ্যে একটি ইতিবৃত্তীয় সংকেত রয়েছে। অথবা, এই শতানন্দ আরও পূর্বের অন্য কোনো গৌতমের পুত্র। যিনি দ্বাপর যুগে বর্তমান ছিলেন?

আবার রাবণের পিতা অদ্ভুতদর্শন মুনিসত্তম পুলস্ত্যের কাছে ভীষ্ম বিভিন্ন তীর্থের বর্ণনা শুনছেন, এটিও মনকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তোলে। কারণ ভীষ্ম যে একজনই ছিলেন, এ বিষয়ে কোথাও কোনো সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই তা হলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় থেকে রামায়ণের রচনাকাল, অথবা লঙ্কারাজ রাবণের নিধন ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতোটা ছিল, এ বিভ্রান্তি থেকেই যায়।

মন্দোদরীর পিতা ময়দানব যুধিষ্ঠিরের মণিময়ী সভাস্থল নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু ময়দানব যে একজনই ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ময়দানব একজন মাত্র ব্যক্তি ছিলেন না। এটি বংশপরম্পরা, অথবা গুরুশিষ্য পরম্পরা। অতএব মন্দোদরীর পিতা ময়দানবই যে যুধিষ্ঠিরের সেই অভূতপূর্ব সভাস্থল তৈরি করেছিলেন, এটি নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

আপাততঃ সময় ও কাল সম্পর্কে আমি আর বিচরণ ক্ষেত্রকে দীর্ঘতর করতে চাই না! এখন আমি ইতিহাসের পথ ধরে একটি বিশ্বাসে

উপস্থিত হচ্ছি। সংহিতা যুগ বলে নিশ্চয়ই একটি যুগ ছিল। আমি পূর্বেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পতন ও উত্থানের কথা বলেছি, সেটি ইতিহাসসম্মত বিষয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই, নারীরা যদৃচ্ছাগামিনী ছিলেন। যেমন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আমরা বর্তমানেও দেখতে পাই, পুরুষ যদৃচ্ছাগামী। এর সঙ্গে অর্থ ও সম্পদের বিষয়টি ছিল।

৭

এই ভাবে যদি আমি অগ্রসর হই, তাহলে দেখতে পাই, মাতৃতান্ত্রিক সজাজে নারী যদৃচ্ছাগামিনী হলেও, তৎকালে তার কোনো দোষ হতো না। এই ব্যবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটল, তখন নারীকে পুরুষ তার নিজের শক্তিবলে নারীর যৌনস্বাধীনতা হরণ করলে। অথচ নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখলো। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নারীকে কি বন্দী করে রাখা সম্ভব হয়েছিল ?

হয় নি যে, তার অনেক প্রমাণ স্বয়ং বিশ্বখ্যাতা রমণীরাই রেখে গিয়েছেন। শুধু লক্ষণীয় একটি বিষয় যে, সংহিতা বা আধুনিক ইতিহাসের বা নৃতাত্ত্বিক বিচারে মাতৃতান্ত্রিক যুগে, নারী যে-রকম মুক্ত স্বাধীন ছিল, পরবর্তীকালে যৌনাচারের ক্ষেত্রে তাকে গোপনীয়-তার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এব্যাপারটি স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে কলঙ্কিত বলে গণ্য হতো। কারণ তখন পুরুষের শাসনে সমাজ চলছে। আরও একটি বিষয় দেখছি। ক্ষেত্রজ পুত্রের প্রচলন আগে থেকেই ছিল। পৌরাণিক কালে আমরা বেশ কিছু ক্ষেত্রজ পুত্রকে দেখেছি। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধের পরে, কুন্তীর ক্ষেত্রজ পুত্রদের জন্মের পরে আর কোনো ক্ষেত্রজ পুত্রের সন্ধান পাচ্ছি না। তাও পাণ্ডুর অনুরোধ রক্ষায় কুন্তী প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। এই আপত্তির বিষয়টি কতোটা বিশ্বাসযোগ্য, তা আমাদের নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। তাঁর আপত্তি শুনে, পাণ্ডু কুন্তীকে অবগত করান, সমাজে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এবং এ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হতো। অতএব কুন্তীর এ বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। এ ঘটনাও বিশ্বাসযোগ্য না। স্বয়ং পাণ্ডু নিজেই তাঁর মৃত পিতার

ক্ষেত্রে, বিধবা মায়ের গর্ভে, কানীনপুত্র বেদব্যাসের ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন। অতীতের সমাজের কথা না বলে কুন্তীকে তো তিনি নিজের পরিচয়েই ক্ষেত্রজ বলতে পারতেন। কেন বললেন না?

কুন্তী নিজে কন্যকাবস্থায় গর্ভবতী হয়েছিলেন। তাঁর একটি কানীন-পুত্র হয়েছিল। ইতিহাসের অত্যন্ত বিখ্যাত চরিত্র, মহাবীর কর্ণ তাঁর নাম। সেই ইতিহাসের কাহিনীতে আমি গমন করবো। তাহলে আপাততঃ আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

কর্ণের পরে কোনো কানীনপুত্রের সংবাদ ইতিহাসে নেই। পঞ্চ-পাণ্ডবের পরে কোনো ক্ষেত্রজ সন্তানের সন্ধানও পাচ্ছি না। এর থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হয়, সমাজ থেকে এই সব প্রথা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ কিছু ঘটে থাকলেও আমরা ইতিহাসে আর তার কোনো ঘটনা ঘটতে দেখছি না।

পৃথার সন্ধানে যাবার আগে, ইতিহাসের আরএকটি দিক, ধুলাচ্ছন্নতা থেকে উন্মোচন করা উচিত। আমি দেখছি, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই বা ছিল না, কালের প্রভাব যে প্রতিরোধ করতে পারে। মহা ইতিহাস মহাভারতের আদি খণ্ড প্রথম অধ্যায় থেকে, আমি যুগধর্ম বা কালপ্রভাব সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "...ভাব, অভাব, সুখ, দুঃখ, সবই কাল সহকারে ঘটে থাকে। কাল প্রজা-সকলকে (সমগ্র মানব জাতিকে) দগ্ধ করছেন, আবার কালই তাদের শান্ত করছেন। এই সমগ্র নিখিল ভূমণ্ডলস্থিত, শুভাশুভ সমুদয় বস্তু কাল হতে সৃষ্ট হচ্ছে। আবার কালেতেই লোক লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। পুনর্বার কাল থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে। সমুদয় জীব নিদ্রিত হলেও, কাল জাগরিত থাকেন। কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। কাল অপ্রতিহত রূপে সর্বভূতে সমভাবে বিচরণ করছেন। বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ, সকল বস্তুই কাল নির্মিত।"

আমি এই মুহূর্তে ফিরে আসছি, আজকের এই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা

আধুনিক দর্শনতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক একটি ব্যাখ্যায়। কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রথম সন্ধান পান হেগেলের দর্শনতন্ত্রের বিচারে। কিন্তু হেগেলের কাছে তাঁদের অপরিশোধ্য ঋণ থাকলেও তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, হেগেল তাঁর দর্শনতন্ত্রের শেষ অধ্যায়ে এসে একটি পরম ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। পরম ব্যাখ্যার অর্থ হলো, তারপরেই ইতি। দর্শনতন্ত্রের শেষ কথা।

মার্কস আর এঙ্গেলস এখানে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ, পরম ও চরম বলে বিশ্ববিজ্ঞানের ব্যাপার কিছুই থাকতে পারে না। পৃথিবীতে কোনো সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, কোনো দর্শনতন্ত্র শেষ বলে ঘোষিত হতে পারে না। এ পৃথিবী নিরন্তর ধাবমান, এবং তার সঙ্গেই, মানুষ সমাজ, সমস্ত ব্যবস্থাই, নিরন্তর মহাকালের পথ পরিবর্তনশীল। কোনো এক জায়গায় বা কোনো কালেই দাঁড়িয়ে ছিল না থাকবেও না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রবক্তা হয়েও, বিশ্ববীক্ষার ক্ষেত্রে, হেগেলে এই নিত্যতা প্রকাশ একটি বড় ভ্রান্তি! বিশ্ব অনিত্য।

আজকের যাঁরা মার্কসবাদী, তাঁরা হয়তো মহাভারতকে একটি অবৈজ্ঞানিক রূপকথা ভাবেন। অবশ্য আমি সকল মার্কসবাদীদের কথা বলছি না। কিন্তু মার্কস মারা যাবার পরে এঙ্গেলস, হেগেলের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে, মার্কসের কিছু টীকা আবিষ্কার করে-ছিলেন। তখনই তিনি ভেবেছিলেন, মার্কস তাঁর টীকায় হেগেলের বস্তুবাদ সম্পর্কে এমন কিছু লিখে গিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাখ্যা তখন করা উচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ায়, মার্কসের টিকার সাহায্যে, হেগেলের 'পরম বা চরম' সম্পর্কে এঙ্গেলস, নিরন্তর বিশ্ববীক্ষার ব্যাখ্যাটি করে যান।

তাহলে আমরা দেখছি, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, মহাভারতকার সেই নিরন্তর কালপ্রবাহের দ্বারা মানুষের জীবনের ঐতিহাসিক

ব্যাখ্যাই করে গিয়েছেন। সেখানেও দেখছি, পরম বলে কিছু নেই। শেষ কথা বলার জন্য পৃথিবীতে কেউ জন্মায় না। কারণ, শেষ কথাটি যে কী, তা কেউ জানেন না।

কেউ কি জানেন না? জানেন। একমাত্র এক শ্রেণীর ভণ্ডরা। যারা নানান বেশভূষায়, সরল বিশ্বাসী নরনারীদের, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বঞ্চনা করে।

এই কালপ্রভাবের কথায় আমি এলাম এই কারণেই, আমাদের অতীত ইতিহাসের যিনি যতো বিশাল ক্ষমতার মানব মানবীই হোন, কালপ্রভাবকে কেউ জয় করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের অভূতপূর্ব প্রতিভা ও কীর্তির জন্য, অনেককেই আমরা অতিমানব বলে পূজো করে থাকি। কারণ তাঁরাই আমাদের দান করেন সেই দৃষ্টি-অনুভূতি ও জ্ঞানের মহিমা।

এই কালপ্রভাবের সঙ্গেই, একটি বিষয়ের উত্থাপন করা অনিবার্য হয়ে উঠলো। কারণ, আমরা এই প্রসঙ্গটি অতিক্রম করতে পারলেই পৃথার জীবন ইতিহাসকে বাস্তব বলে, সবদিক দিয়ে গ্রহণ করতে পারব।

আমি দেখছি, অনেক মুনি-ঋষির জন্ম অদ্ভুত ও অলৌকিক। যেমন ধরা যাক, দ্রোণ। দ্রোণের পিতা মহর্ষি ভরদ্বাজ গঙ্গার ধারে বাস করতেন। একদিন তিনি গঙ্গা স্নানে গিয়েছেন। গিয়ে দেখলেন, ঘৃতাচী নাম্নী এক অপ্সরা গঙ্গায় স্নান করে, তীরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বাতাস এসে, ঘৃতাচীর শরীর থেকে সমস্ত বস্ত্র উড়িয়ে নিয়ে গেল। মহর্ষি ঘৃতাচীর মতো সুন্দরী যুবতী অপ্সরাকে বিবসনা দেখে তখনই তার সঙ্গে বিহারের বাসনায় কাতর হয়ে পড়লেন। আর ঘৃতাচীর সামনেই ব্রহ্মচারী মহর্ষি ভরদ্বাজের রেতঃস্খলন হয়ে গেল। রেতঃস্খলন হবা মাত্র, মহর্ষি তা দ্রোণী মধ্যে স্থাপন করলেন, এবং তা থেকেই ধীমান দ্রোণ উৎপন্ন হলেন।

দ্রোণী শব্দের অর্থ, জলের গামলা। এরকম মুনি-শ্রেষ্ঠদের জন্ম আমরা আরও অনেক পেয়েছি। কেউ কুম্ভযোনিতে উৎপন্ন হয়েছেন। যে সমস্ত ঘটনা উদ্ধার করতে গেলে, আর একটি ইতিহাস রচনা করতে হয়।

ইতিহাসের এক অধ্যায়ে দেখছি, পরাশর মুনি, বিদেহরাজকে বলছেন, 'জন্মনিবন্ধন মহর্ষিদের অপকৃষ্ট হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাঁরা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। বিশেষতঃ তাঁদের পিতারা, যে-কোনো স্থানে তাঁদের উৎপাদন করে, তপোবলে তাঁদের ঋষিত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডরুপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান, কমঠ, সবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুমদ ও মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন. তপোবলে ঋষিত্ব লাভ করে বেদবিদগ্রগণ্য ও দমগুণ সম্পন্ন হয়েছিলেন। 'যোনি' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'উৎপত্তিস্থান'। এখন অপকৃষ্ট যোনি বলতে যদি অপ্সরা বা অনামা স্ত্রীলোকদের বোঝায় তা হলেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, দ্রোণী বা কুম্ভযোনি ইত্যাদি বস্তুর নামের সাহায্য নেওয়া। দ্রোণী শব্দের অর্থ কী, আগেই তা বলেছি। যে-কোনো ভাষ্যে, যে-ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক, পরনারীর দৈহিক মিলন ব্যতীত লোকসৃষ্টি একটি অসম্ভব বিষয়। এর কোনো সত্যাসত্যই নেই, এবং এটি একটি মিথ্যা কথন মাত্র। অথবা, সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করার জন্যই, মহাভারত বা পুরাণে যারা প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়েছে, তারাই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির মূলে।

যেমন ভারত ইতিহাসের আদি খণ্ডেই দেখছি, বিবৃত হয়েছে, 'রামায়ণ, আত্মার সনাতন পবিত্র জন্মক্ষেত্র ঋষিদিগের এমন শক্তি নাই যে, স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন।'

'পুরুষ ব্যতীত, স্ত্রীজাতি গর্ভধারণ করিতে পারে না। স্ত্রী জাতি

ব্যতীত পুরুষও কখনও সন্তান উৎপাদনে সক্ষম নয়! স্ত্রীলোকের ঋতুকালে, (ঋতুস্নানের সময় থেকে ১৬ দিন) পুরুষের পরস্পর সহযোগ দ্বারাই সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, পিতা হতে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা, মাতা হতে ত্বক, মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হয়ে থাকে। 'কুম্ভা' শব্দের অর্থ ই বেশ্যা। অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম কুম্ভা যোনিতে। কালক্রমে, কুম্ভার আকারটি কেটে দিয়ে, কেবল কুম্ভ করা হয়েছিল।

জন্মের সঙ্গে প্রতিভার কোনো সম্পর্ক নেই। পরাশরের কথায় তা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য পরাশর স্বয়ং স্বপাক অনার্য কন্যার গর্ভজাত সন্তান। ব্যাসের জন্মের কথা আগেই বলা হয়েছে। ব্যাসের পুত্র শুকদেব ম্লেচ্ছ কন্যা শুকীর গর্ভজাত। এরকম অনেকের কথাই বলা যায়, যাঁরা হীনযোনিতে জন্মেও ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ কোনো বংশধারায় জন্মাতো না। প্রতিভা ও জ্ঞান, এবং তপোবলের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা সম্ভব ছিল।

এইসব ইতিবৃত্তীয় ঘটনা থেকেই, আমরা বুঝতে পারছি, নরনারীর মিলন ব্যতিরেকে, সন্তান জন্ম সম্ভব না। অতএব, অযোনিসম্ভবা বা ইত্যাদিও একান্তই অবাস্তব ও অলৌকিক। এসব অলৌকিক বিষয়ের দ্বারা, আমরা আমাদের ইতিহাসকেই কলঙ্কিত করেছি।

কানীন পুত্র, ক্ষেত্রজ পুত্র, এসব কিছুই অলৌকিক বলে বর্ণনা করা হয় নি। কিন্তু কোনোও এক অতীতকালে, কানীন পুত্র বা ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মের জন্য, আদৌ কোনো সমাজ ভয়, বা সমাজ বিগর্হিত কাজ বলে গণ্য হতো না। কালে, ও কালের প্রয়োজনে সেই ভয় বা সমাজ বহির্ভূত কাজ মনে করা হতো।

নরনারীর মিলন ব্যতিরেকে, কোনো সন্তানই উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। বর্তমান যুগে অবশ্য ভ্রূণকে, ঋতুকালীন স্ত্রীলোকের জরায়ুতে প্রাবশ করিয়ে, সন্তান ধারণের বৈজ্ঞানিক চেষ্টাটি সফল

হয়েছে। কিন্তু কোনো পুরাণের কোথাও, প্রজাসকল উৎপত্তির এমন সংকেত দেওয়া হয়নি।

পুরাণের 'পঞ্চকন্যার' ইতিহাস একমাত্র কুন্তীই এদের মধ্যে কানীন পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এবং ক্ষেত্রজ পুত্রেরও। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই কোনো অলৌকিকতা ছিল না। সেইসব সবিস্তারে বিচারের পর, পৃথার সন্ধানে আমি প্রথম যাবো মথুরায়। কারণ, যদুবংশ জরাসন্ধের হাতে নির্বংশ হবার ভয়ে, কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন, যেমন করেই হোক, যদুবংশকে বাঁচাতেই হবে। কংসকে হত্যা করলেও যদুবংশ নিশ্চিত হতেপারে নি! জরাসন্ধের ভয়ে তারা সর্বদাই সশঙ্কিত ছিল। শেষ পর্যন্ত, কৃষ্ণ মথুরা থেকে, যদুবংশকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দ্বারকায়।

ইতিহাসের এই সূত্র ধরেই, কৃষ্ণের পিসীমাতা পৃথার জন্ম যে মথুরাতেই হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৮

যদুবংশীয় শূরের পুত্রের নাম বসুদেব। কন্যার নাম পৃথা। অল্প বয়সেই দেখছি, পৃথা খুবই সুন্দরী। অংসাবতরন অধ্যায় হতে জানা যায়, সিদ্ধিদেবীর অংশে পৃথার জন্ম।

শূরের পিসতুতো ভাইয়ের নাম ছিল কুন্তিভোজ। এঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না! কুন্তিভোজ ছিলেন অশ্বনদীর তীরবতী রাজ্যের রাজা। তিনি শূরের নিকট একটি সন্তান প্রার্থনা করলে, শূর তাঁর কন্যা পৃথাকে কুন্তিভোজের কন্যা রূপে দান করেন।

এই ঘটনাটির দ্বারা প্রমাণ হয়, সেইকালে কন্যাকেও দত্তক রূপে গ্রহণ করা হতো। রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা বলেই, পরে পৃথার নামকরণ হয় কুন্তী। কুন্তীর যৌবনকালের একটি বর্ণনায় পাচ্ছি, তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। দীর্ঘনয়না, রূপ-যৌবন-শালিনী, স্ত্রী-সুলভ গুণবতী, গম্ভীরস্বভাবা, মহাব্রতা ও ধর্মশীলা। অনেক নৃপতিই সেই তেজস্বিনী নারীকে পত্নীরূপে পাবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন।

পৃথা কি রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা হিসাবে সুখী হয়েছিলেন? কখনও হন নি। বরং তাঁর অল্প বয়সে মনের দিক থেকে এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের হয়েছিল। তিনি সারা জীবনে কখনও ভুলতে পারেন নি তিনি তাঁর নিজের পিতামাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। শিশুরমনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিষয়টিকে দেখছি, পৃথা রাজা কুন্তিভোজ গৃহে পালিত হবার সময়, সর্বদাই মনমরা হয়ে থাকতেন। অথচ অল্প বয়স থেকেই বুদ্ধিমতী ছিলেন। মনের দুঃখের কথা তিনি রাজ-পরিবারের জ্যেষ্ঠদের কখনও জানতে দিতেন না।

পৃথার বাল্যের ধাত্রীগণ ব্যতিরেকেও ছিলেন অনেক সখী। কিন্তু কুন্তী যে সখীদের সঙ্গে নিতান্ত বালিকা ভাবে চঞ্চলতা প্রকাশ করতেন, এমন দেখা যেতো না। বরং শিশুকালেই যেহেতু তিনি পিতৃমাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, সেইহেতু তাঁর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। সেটি হলো, তাঁর অনন্য মনোভাব।
কুন্তী যে দেখতে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন, সে তো আমি দেখছিই। তিনি সখীদের সঙ্গে নানা রহস্যালাপ করলেও তাঁর চরিত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, তিনি সহজে নিজের রসসিক্ত মনকে সকলের সামনে খুলে ধরতেন না। তাঁর চরিত্রের কথা নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও, তিনি যে ক্রমেই একটি জটিল চরিত্রের নারী হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রথম প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁর প্রথম যৌবনেই। অথচ অন্যান্য বিশেষণে ভূষিত করে, তাঁর চরিত্রের জটিলতার দিকটিই নানাভাবে আবৃত করে রাখা হয়েছে।
শৈশবে মনের গোপন দুঃখই অন্য কন্যাদের তুলনায়, ভিন্নতর করে তুলেছিল। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও, কুন্তী অনেক বয়সে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'আমি দুর্যোধনকে বা নিজেকে দোষ দিই না। আমার পিতাকেই আমি নিন্দা করি। বদান্যরূপ প্রখ্যাত ব্যক্তি যেমন নিজের ধন অপরকে অক্লেশে বিলিয়ে দেন, আমার পিতাও সেইরকম আমাকে কুন্তিভোজের কন্যারূপে সমর্পণ করেছিলেন। আমি শৈশবে যখন কন্দুকক্রীড়া (পুতুল লাটিম ইত্যাদি খেলা) করতাম, তখনই তোমার পিতামহ, আমার পিতা, তাঁর সখা রাজা কুন্তিভোজের হাতে আমাকে দত্তক কন্যা রূপে সম্প্রদান করেন। হে পরন্তপ, (কৃষ্ণ) সেই আমি পিতার দ্বারা পিতৃস্নেহে বঞ্চিত...'
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পরে, সেই বয়সেও পৃথা তাঁর পিতৃস্নেহে বঞ্চনার কথা ভুলতে পারেন নি। শৈশবে যে তাঁর মনে, সেই ঘটনা, তাঁর

চরিত্রকেই অনন্যতা দান করেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

পৃথাকে দত্তক কন্যা রূপে লাভ করার পরে, রাজা কুন্তিভোজ আর অনপত্য ছিলেন না। তাঁর সন্তানাদি হয়েছিল। অতএব, কুন্তীই তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলেন না।

রাজা কুন্তিভোজের কাছে, অনেক মুনি ঋষিরা আসতেন। রাজা তাঁদের অভ্যর্থনা করতেন। এবং কুন্তীকে তিনি সেই সব মুনি ঋষিদের সেবায় নিযুক্ত করতেন। ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে, এমনভাবে এই সেবার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, যেন দুর্বাসা ব্যতিরেকে আর কোনো মুনি ঋষিকে, কুন্তীর সেবা করতে হয় নি, ঘটনা তা না। রাজা কুন্তিভোজ তাঁর এই দত্তক কন্যা কুন্তীকে মুনি ঋষি মহাপুরুষদের সেবায় নিযুক্ত করতেন।

কুন্তী যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখনই রাজা কুন্তিভোজের গৃহে আবির্ভূত হলেন মুনি দুর্বাসা। কিছু স্থূল বুদ্ধি বা মতলবী ব্যক্তি, দুর্বাসার উপস্থিতির সময়ে, কুন্তীকে নিতান্তই বালিকা বলে বর্ণনা করেছেন। অথচ স্বয়ং দুর্বাসার 'দেবী!' বা 'চারুহাসিনী' এরকম বহুতর সম্বোধনেই বোঝা যায়, কুন্তী তখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন।

দুর্বাসা সহসা কুন্তিভোজের গৃহেই বা আগমন করলেন কেন। রাজা তো ভারতের নানা স্থানে অনেক ছিলেন। কুন্তিভোজের কাছেই বিশেষ করে এলেন কেন? এই মহর্ষি দুর্বাসা দেখতে অবশ্য সুপুরুষ ছিলেন। তীব্র তেজস্বী, মহাদীর্ঘকায়, শ্মশ্রুদন্ত-জটাজুটধারী অতি সুন্দর ও সুদর্শন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তপস্যার তেজে প্রজ্বলিত, তপধ্যায়-শীল, মধুরভাষী মহাতপস্বী। অনেক বর্ণনার মধ্যে একটি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি একটি বিশেষ প্রচার ছিল, মহর্ষিটি ভারি কোপন স্বভাবের ব্যক্তি। আর এ প্রচারটা এমন ভাবেই করা হয়েছিল, তাঁর

দর্শন মাত্র, আগেই লোকের মনে হতো, কী জানি কী ভুল করে বসবো। তারপর অভিশাপে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

দুর্বাসা কেন কুন্তিভোজের গৃহেই সহসা একদিন আগমন করলেন তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। সম্ভবতঃ দুর্বাসা জানতেন, কুন্তিভোজের গৃহে একটি পরম রূপসী কন্যা আছে, এবং সে নাকি মুনি ঋষিদের সেবায় বিশেষ যত্নশীলা। অতএব তাঁর মতো একজন পরম রূপবান, সূর্যসদৃশ তেজস্বী মহর্ষিই বা কেন কুন্তীর সেবা গ্রহণ করবেন না? সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, তিনি রাজা কুন্তিভোজের কাছে এসে প্রথমেই বললেন, "হে মহারাজ কুন্তিভোজ, আমি ভিক্ষা গ্রহণ করে তোমার গৃহে কিছুদিন থাকতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি যখন তোমার গৃহে বাস করব, তখন তুমি বা তোমার অন্য কোনো লোক, আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত কোনো আচরণ যেন না করে। এতে যদি তুমি সম্মত হও, তা হলে আমি কিছুকাল তোমার গৃহে বাস করবো। তবে আমার ইচ্ছানুসারে। কিন্তু সব সময়ে যেন, আমার গৃহে শয্যা, আসন প্রভৃতি ব্যবহার্য বস্তু সুশৃংখল ভাবে প্রস্তুত থাকে। এর কোনো অন্যথা যেন না হয়।"

দুর্বাসার এসব কথা থেকে মনে হয়, তিনি আগে থেকেই কিছু ভেবে এসেছিলেন। অন্যথায় যেখানে তাঁকে একবার 'মধুরভাষী বলা হচ্ছে সেখানে এমন শপথ গ্রহণ করানোর কারণ কী?

কোনো সন্দেহ নেই, কুন্তীর রূপ মাধুর্যের কথা ঋষি মুনির সেবার কথা তিনি পূর্বেই অবগত ছিলেন, পরে তাঁর মতো কোপন স্বভাবের লোকের স্বভাবতই মনে হতে পারে, সাধারণ মুনি ঋষিরা যদি সেই অপরূপ কন্যার সেবা পেয়ে থাকে আমি কেন পাবো না? এবং আমার পাওয়া হওয়া চাই সকলের থেকে অনেক বেশি ও 'বিশিষ্ট'।

কুন্তিভোজ নিজেই দুর্বাসার কথা শুনে মনে মনে ভাবছেন, "এই মহর্ষি দুর্বাসা যথেচ্ছাচারী ও কোপন স্বভাব, তাঁকে গৃহে রেখে,

তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী সেবা করা অতি কঠিন কাজ।”…সব জেনেও তিনি কুন্তীর কথাই দুর্বাসাকে বলেছিলেন, “হে মহর্ষি, আমার পৃথা নামে যশস্বিনী কন্যা আছে। যে আপনার সেবা করবে। আমার মনে হয় আমার সেই কন্যার শীলবৃত্ত দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হবেন।”

দুর্বাসাকে ঐ সব বলে, অন্তঃপুরে এসে কুন্তীকে বোঝালেন, “বৎসে! এক মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।…আমি একমাত্র তোমার প্রতিই নির্ভর করে, তাঁর সেবার ভার নিয়েছি।…তুমি সর্বদা একাগ্রচিত্ত হয়ে এই মহর্ষির আরাধনা করবে। আমি তোমার বাল্যকাল থেকেই, তোমার অসাধারণ সেবার মনোভাব অবগত আছি। ব্রাহ্মণগণ, গুরুবর্গ, বন্ধুবর্গ, মিত্রবর্গ, সম্বন্ধিবর্গ এবং মাতৃবর্গ, এমনকি দাসদাসীগণের প্রতিও তোমার অসাধারণ সানুকম্প দৃষ্টি আছে।…হে শোভনাঙ্গী! তোমার সাধ্বিবৃত্তির জন্য সমস্ত ভৃত্যজনও তোমার প্রতি আকৃষ্ট।”…

এত কথা বলে, কুন্তিভোজ কুন্তীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, “তুষ্কুলে সম্ভূত কন্যারা প্রায়শঃ বালস্বভাব প্রযুক্ত, বিপরীত আচরণকারিণী হয়ে থাকে। হে পৃথে, তুমি শ্রেষ্ঠ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছ, এবং তোমার দেহ সৌন্দর্যও অসাধারণ। তুমি বংশ-রূপ-গুণ, এই সমস্ত দ্বারা শোভিত।…হে কল্যাণি! এই মহাতপস্বী কোপন স্বভাব ব্রাহ্মণকে সেবায় সন্তুষ্ট করতে পারলে, তুমি বহু কল্যাণ লাভ করতে পারবে।”

কুন্তী কী দুর্বাসাকে আগে দেখেছিলেন? নাম নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। তিনি রাজা কুন্তিভোজের কথায় অনায়াসেই সেই সম্মতি দিয়েছিলেন। এমন কি, তিনি পালক পিতাকে এমন কথাও বলেছেন, “আমি যখন এই ব্রাহ্মণের সেবায় রত হব, তখন উনি যদি নিয়ম রক্ষা না করে, ভোরবেলা, সন্ধ্যাবেলা গভীর রাত্রে, যখন খুশি আগমন

করলেও আমি একটুও রাগ করবো না। উনি কোনো নিয়ম না মানলেও, আমি কখনও ওঁর সেবা ছেড়ে অন্যত্র যাবো না। আমি যা করলে উনি সন্তুষ্ট হবেন, আমি তাই করবো। আপনি ব্রাহ্মণকে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি তা পালন করবো।"

দুর্বাসাকে বলা হয়েছে, প্রজ্বলিত বহ্নিস্বরূপ। (সূর্য?) এঁর পরিচর্যা করা আর আগুনের মধ্যে প্রবেশ করা, একই কথা। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই এই কোপন স্বভাব মহর্ষিকে সার্থক সেবা করতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণকে তিনি কিছুতেই বিব্রত বা ক্রুদ্ধ করতে পারেন নি।

কুন্তীর কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে তাঁকে দুর্বাসার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই আমার কন্যা। চিরকালই সুখে লালিতা। যদি কোনো অপরাধ ঘটে, আপনি ক্ষমা করবেন।'

দুর্বাসা বললেন, 'তথাস্তু!'

রাজা কুন্তিভোজ সুধা-ধবলিত এক প্রাসাদ দুর্বাসার বাসের জন্য দিলেন। মহর্ষি খাবেন ভিক্ষা করে। কিন্তু থাকবেন সুধা-ধবলিত-প্রাসাদে রাজকন্যার সেবা নিয়ে! কুন্তী প্রস্তুত হয়ে মহর্ষির সেবা শুরু করলেন। দুর্বাসা কখনও বলে বেরোতেন, তিনি অপরাহ্নে ফিরবেন। কিন্তু ফিরতেন অধিক রাত্রে। আবার যেদিন বলে বেরো-তেন, ফিরবেন অধিক রাত্রে, সেদিন ভোরবেলা ফিরে আসতেন। কিন্তু দেখতেন, কুন্তী সর্বদাই তাঁর পছন্দমতো ভোজ্য সায়ন আসন ইত্যাদি নিয়ে সেবার জন্য প্রস্তুত আছেন।

এসব ছাড়াও, দুর্বাসা কুন্তীকে নানারকম ধিক্কার দিতেন। খাবারের নিন্দা করতেন। অপ্রিয় কথায় গালাগালি দিতেন। কুন্তী একটুও রাগ করতেন না। জানতেন, এমন মহর্ষির সেবা করে, তিনি যে-ফল পাবেন, তার তুলনা নেই। তিনি শিষ্যের (শিষ্যা নন) মতো, পুত্রের (কন্যা নন) মতো, ভগিনির মতো দুর্বাসার সেবা করেছেন.

কুন্তিভোজ প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় কুন্তীকে জিজ্ঞেস করতেন, "পুত্রি। ব্রাহ্মণ কি তোমার সেবায় পরিতুষ্ট হচ্ছেন ?"

কুন্তী উত্তরে হেসে বলতেন, "ব্রাহ্মণ যারপরনাই আনন্দিত হচ্ছেন।"

কিন্তু কুন্তী এমন একজন মহর্ষির সঙ্গে কী আচরণ করতেন, আর মহর্ষিই বা কেন এত আনন্দিত হতেন, তার কিছুই বলা যায় না।

> "…তমহং পর্য্যতোষয়ম্।
> শৌচেন ত্বাগসস্ত্যাগৈঃ শুদ্ধেন মনসা তথা
> কোপস্থানেস্বপি মহৎস্বকুপন্ন্য কদাচন।"

কুন্তী বলছেন ··অনপরাধী হয়ে, শুচিতার দ্বারা শুচিসিদ্ধ চিত্তে আমি

মহর্ষি দুর্বাসাকে পরিতুষ্ট করেছিলাম। বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হবার ব্যাপারেও আমি কখনও ক্রুদ্ধ হই নি।

কুন্তিভোজের রাজত্ব হর্ষনদীতীরে বুন্দেলখণ্ডে।
দুর্বাসা প্রায় এক বছর কুন্তীর সেবা গ্রহণ করে, সুখী হয়ে চলে যাবার সময়, তাঁকে বর দিতে চাইলেন। বললেন, "তোমার পরিচর্যায় আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার কাছে অনন্য দুর্বল বর প্রার্থনা কর।"
কুন্তী বললেন, "আপনি ও আমার পিতা যখন সুখী হয়েছেন, তখন আর আমার বরে কী প্রয়োজন?"
কিন্তু দুর্বাসা ছাড়লেন না। তিনি কুন্তীকে বর দিলেন, "···তুমি না চাইলেও, আমি তোমাকে দেবগণকে আহ্বান করার জন্য মন্ত্র প্রদান করছি। গ্রহণ কর। এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি যে-কোনো দেবতাকে আহ্বান করবে, তিনি সকামী বা অকামীই হোন, মন্ত্র প্রভাবে ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্তী হবেন।"
কুন্তী আর আপত্তি করতে পারলেন না। দুর্বাসা তাঁকে অথর্ববেদ-বিহিত মন্ত্র সব দান করলেন। কিন্তু হঠাৎ এমন একটি বর কেন দুর্বাসা তাঁকে দিলেন? আরও অনেক প্রকারের বর তিনি কুন্তীকে দিতে পারতেন। দেবতাদের ভৃত্যের মতো আহ্বান করার শক্তিযুক্ত বর দান করার অর্থ কী?
এখানে এস, ইতিবৃত্তের পাতায় আমি সত্যের সন্ধানে লিপ্ত হচ্ছি। তার আগে, ইতিবৃত্তে প্রক্ষিপ্ত অলৌকিক সংবাদে, ব্রাহ্মণের বিচিত্র মতিগতির কথা কিছু বর্ণনা করতে চাই। কারণ এঁরাই আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তকে, ব্রাহ্মণ্য মহিমার দ্বারা (মূর্খতা!) এমন ভাবে মিথ্যায় আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, যাতে সত্য কখনও প্রকাশ না পায়। আর ব্রাহ্মণরা যে কী ভয়াবহ শক্তিশালী ছিলেন, তার প্রমাণের জন্য

যা মনে এসেছে, তাই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। অথচ আমরা জানি, ব্রাহ্মণ কোনো জাতি ছিলেন না। প্রতিভা জ্ঞান ও তপোবলে, জারজ পুরুষও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতেন।

অলৌকিকত্বের প্রমাণ স্বরূপ, ঋষি দীর্ঘতমার এক দীর্ঘ কাহিনী, কুন্তীর কারণে, এক ব্রাহ্মণ তুলে ধরেছেন। আমি সংহিতা যুগে বিচরণের সময়, দীর্ঘতমাকে দর্শন করেছি। তাঁর গো-গণের ন্যায় উন্মুক্ত স্থানে যখন তখন মৈথুন কার্যে লিপ্ত হওয়ায় আশ্রমের মুনি ঋষিরা তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে আশ্রম থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী প্রদ্বেষীও তাঁর প্রতি বিশেষ রুষ্ট হয়েছিলেন। দীর্ঘতমা ছিলেন অন্ধ। প্রদ্বেষীর গর্ভে তাঁর অনেকগুলো পুত্র হয়েছিল। তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে প্রদ্বেষী ও তাঁর পুত্রগণ, দীর্ঘতমাকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

দীর্ঘতমা ভাসতে ভাসতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যান। বলি নামে এক রাজা ছিলেন। অসাধারণ ধার্মিক। তিনি গঙ্গায় স্নান করতে এসে মুনিকে ভেলায় ভেসে যেতে দেখে, নিজের গৃহে নিয়ে আসেন। এবং তিনি যে ভগবান দীর্ঘতমা, দেখেই চিনতে পারলেন। বলি ছিলেন অপুত্রক! তিনি দীর্ঘতমাকে অনুরোধ করলেন, তাঁর ভার্যা-দের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার জন্য। দীর্ঘতমা সম্মত হলেন। রাজা বলি তাঁর পট্টমহিষী সুদেষ্ণাকে ঋষির নিকট গমন করতে বললেন। সুদেষ্ণা দেখলেন, ঋষি অন্ধ ও বৃদ্ধ। তখন তিনি নিজে না গিয়ে এক শূদ্রা পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমা, জেনেশুনেই এগারোটি পুত্রোৎপাদন করলেন, পুত্ররা যখন সবাই অধ্যয়নরত হয়েছে, রাজা বলি খুবই খুশি হলেন। কিন্তু দীর্ঘতমা বললেন, "এরা তোমার ক্ষেত্রে, হয় নি। শূদ্রাযোনিতে আমি এদের উৎপন্ন করেছি। সুতরাং এরা আমারই পুত্র। আমাকে অন্ধ আর বৃদ্ধ দেখে, তোমার মহিষী সুদেষ্ণা আমার কাছে আসেন নি।"

রাজা বলি সে-কথা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। সুদেষ্ণাকে নানা রকম অনুনয়পূর্বক, দীর্ঘতমার কাছে পাঠাতে সক্ষম হলেন। দীর্ঘ-তমা সুদেষ্ণাকে ভোগ করলেন না। তাঁর গায়ে হাত বুলিয়েই বলে দিলেন, "তোমার অত্যন্ত তেজস্বী পাঁচ পুত্র হবে। তারা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম বলে পরিচিত হবে। তাদের নামানুসারে অঙ্গ বঙ্গাদি দেশ প্রসিদ্ধ হবে।"···

অতএব ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা হলো, দেবতা, ঋষিগণ যে-ভাবে পুত্র উৎপাদন করেন, তা লৌকিক বিধি নয়। তা দিব্যবিধি। এরূপ দিব্যবিধিতে কোনো রূপ দোষের বা পাপের সম্ভাবনা নেই। কারণ, অনেক তির্যক যোনিতে সর্বদা এরূপ জন্ম ঘটেছে। যেমন, কচ্ছপ, ময়ূরী, বলাকা, এরা পুরুষ সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই গর্ভ ধারণ করতে পারে।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু কচ্ছপ, ময়ূরী তো মানবী নয়। এ বিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই জেনে এসেছি, দেব-দানব মানব, যে কোনো জাতির মানুষের, নরনারীর দৈহিক মিলন সম্ভূত ছাড়া সম্ভব না।

এইসব অবাস্তব অলৌকিকতায় বিশ্বাসী পণ্ডিতবর্গের প্রতি অভি-যোগ করা প্রহসন মাত্র। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন, ঋষি স্ত্রী-লোকের গায়ে হাত স্পর্শ করলেই, স্ত্রীলোকটি সন্তান সম্ভবা হয়। কুন্তীর সঙ্গে সূর্যের সহযোগিতায় কর্ণের জন্মও সেই রকমই এঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আর সেই সূর্য যে আকাশ থেকেই নেমে এসেছিলেন, সে-বিষয়েও এইসব পণ্ডিতের মনে কোনো সন্দেহ নেই। হে সূর্য! তুমি আকাশ থেকে নেমে, একবার এই সব পণ্ডিতের দেহ স্পর্শ করে যাও।

একমাত্র, এই কারণেই, কুন্তী যখন কুমারী অবস্থায় রজস্বলা হলেন, তখন খুবই লজ্জিতা হলেন। অনন্তর তিনি প্রাসাদ মধ্যে রমণীয় শয্যায় উপবেশন পূর্বক সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। দেখলেন,

কবচ কুণ্ডল যুগলমণ্ডিত দিব্য জ্যোতি সূর্যদেব। তখনই ব্রাহ্মণের সেই মন্ত্রের কথা তাঁর মনে পড়লো। তিনি সেই মন্ত্রের দ্বারা সূর্যকে আহ্বান করলেন। করে ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। কারণ, সূর্য সত্যি এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'হে কল্যাণি, আমি মন্ত্র প্রভাবে, তোমার নিতান্ত অধীন হয়ে আগমন করেছি। বলো, আমাকে কী করতে হবে।"

কুন্তীর কী দুরবস্থা! সূর্য যতই তাঁকে বর দিতে চান, তিনি কিছুতেই তা গ্রহণ করতে পারছিলেন না। কিন্তু সূর্য পরিষ্কারই বলে দিলেন, আমি জানি, তুমি কবচ-কুণ্ডলমণ্ডিত, আমার ন্যায় সন্তান উৎপাদন করাই তোমার অভিলাষ। তুমি সম্মতি দিলেই আমি সেই অভিলষিত পুত্র উৎপাদন করবো।

কুন্তী দেখলেন, এ ভারি গর্হিত কাজ। বাবা মা জানবেন না। অথচ আমার সন্তান হবে। তখন কী করবো? সূর্য বললেন, "তোমার কন্যকাবস্থা নষ্ট হবে না। তুমি যেমন সন্তান চেয়েছো, সেই রকমই আমি উৎপাদন করব। আর তুমি যে কবচকুণ্ডলসহ বীর সন্তান চেয়েছে, তাই আমি দান করবো।"

কুন্তী সম্মত হলে, সূর্যদেব তাঁর নাভিদেশ স্পর্শ করা মাত্র, তিনি তেজঃপ্রভাবে অচেতন হয়ে শয্যাতলে পড়ে রইলেন। এবং সূর্যদেব স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুন্তীকে মোহিত করে, যোগ বলে গর্ভাধান করলেন। কিন্তু তাঁর কন্যকাবস্থা দূষিত করলেন না।

বলাবাহুল্য, এই অলৌকিক, অবাস্তব, মিথ্যা কাহিনী আর যাঁরাই বিশ্বাস করুন, বাস্তব ইতিবৃত্তে যাঁরা বিশ্বাসী, এবং প্রকৃতই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাঁদের মধ্যেও নানা কৌতূহল ও ইচ্ছা জাগে, অথচ তার জন্য তাঁরা সমস্ত রকম দায় দায়িত্ব গ্রহণেব দ্বারা, নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। নারীকে যারা নিতান্ত দেহ শুচিতার বিচারে কেবল পুত্রোৎপাদনের যন্ত্র মনে

করেন, তারাই ঐসব অলৌকিক অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপারকে লোক মধ্যে প্রচার করে, মানুষকে সত্য সন্ধানে বঞ্চিত করেন।

এখন, ইতিবৃত্তের ধুলাচ্ছন্ন পাতার অন্তরালে, কুন্তীর সেই আরাধ্য পুরুষটিকে কেমন করে আবিষ্কার করা যায়? কুন্তী চরিত্রের দ্বারা, আমি মোহিত। আমি দেখছি, শৈশবের সেই বালিকা, তাঁর তারুণ্যে এসেই, এমন এক তেজঃপুঞ্জপূর্ণ তপস্বীর, সমস্ত রকম স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারেও অসুখী হন নি, রাগ করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও, রাগ করেন নি, এবং যিনি কুন্তীর কাছে রাত্রে, ভোরে, সন্ধ্যায় যখন খুশি আসতেন, কখনও গঙ্গাজল দিতেন, নিন্দা করতেন, তবু কুন্তী তাঁর বাধ্য থাকতেন, এ সবই কি কুন্তীর বাল্য থেকে প্রাপ্ত, দুঃখের মধ্য থেকে, নতুন জীবনকে জানার ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় না?

আমি তো দেখছি, দুর্বাসাকে যে যাই বলুন, অন্তরে তিনি মোটেই কোপন স্বভাব ছিলেন না। বরং মধুরভাষী ছিলেন। দেখতেও ছিলেন, অসাধারণ তেজবহ্নি স্বরূপ সুপুরুষ। পরাশরের তুলনায় তিনি আরও অনেক বেশি গুণসম্পন্নই দেখছি। পরাশর যদি সত্যবতীকে গর্ভবতী করে কন্যকাবস্থা দূষিত না করে থাকেন, ইনিই বা কুন্তীর কন্যকাবস্থা দূষিত করবেন কেন?

কুন্তিভোজ রাজার গৃহে, দুর্বাসার প্রথম আবির্ভাবই যেন একটি সংকেত দেয়, তিনি কুন্তীর সেবা পাবার জন্যই এসেছিলেন। এবং তিনি কুন্তীভোজকে দিয়ে এমন সব কথা আদায় করে নিয়েছিলেন, স্বভাবতঃই মনে হয়, তাঁর মনে কোনো অভিসন্ধি ছিল। থাকলেও তা তেমন অপরাধের কিছু না। দুর্বাসার নিশ্চয়ই এমন কোনো গুণাবলী ছিল স্বয়ং কৃষ্ণও পরে এই মহর্ষির তুষ্টি বিধানের পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

দুর্বাসার মতো বহ্নিকান্তিমান পুরুষকে দেখে মুগ্ধ হওয়া কি খুবই

আশ্চর্যের ? তিনি বৃদ্ধ বা কুরূপ ছিলেন না। কুন্তীও আর দশটি কন্যার মতো, মনের দিক থেকে সাধারণ কন্যা ছিলেন না সূর্যদেবের মুখ দিয়ে কুন্তীকে বলানো হয়েছে, "তোমার পিতামাতা অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নহেন।" তা যে ছিলেন না, দুর্বাসা আগেই সেবার দায়স্বরূপ,কুন্তীর প্রতি যথেচ্ছাচারের বিষয়টি স্থির করে নিয়েছিলেন।

অতঃপরেও যদি, দুর্বাসাকেই সেই পুরুষরূপে আমি গ্রহণ করি, তাহলে, স্বর্গের রাজা সূর্যকেই আমি এই ভারতের অশ্বনদীর তীরে, (অধুনা বুন্দেলখণ্ডে) ভ্রমণ করতে দেখতে পাচ্ছি ? স্বর্গলোক থেকে, এই মর্ত্য ভারতে, সর্বদাই দেবতা ও মানুষ জাতির যাতায়াত ছিল। আমি আমার ইতিবৃত্তের ভ্রমণে স্বর্গ থেকে আগেই ঘুরে এসেছি। স্বর্গলোক অতীব স্বাস্থ্যকর বলে, বেদে এই দেশসমূহকে 'অমৃতভূমি' বলা হয়েছে ? এবং অধিবাসীরাও স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘায়ু ছিলেন।

যদিও ইতিহাসের অপরিচ্ছন্ন অস্পষ্টতায়, আমি বাস্তব দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছি না, তথাপি আমি যেন কুন্তীর অন্তরের মধ্যে দুর্বাসাকেই অঙ্কিত দেখছি। কিন্তু ইতিহাস এ বিষয়ে এমনই নীরবতা অবলম্বন করেছে, আমি সুস্পষ্ট রূপে কিছুই দেখছি না।

এই অবস্থায়, আমি স্বর্গলোকের এক রাজ্যের অধিপতি সূর্যকে অশ্বনদীর তীরে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি, ধাত্রী ও সখীগণ সহ কুন্তীও সেখানে বিচরণ করছিলেন ! সহসাই দুজনের সঙ্গে চারি চক্ষের মিলন। চক্ষের মিলনই তাঁদের দেহ মিলনে আকৃষ্ট করলো। কিন্তু কুন্তী তখন রজস্বলা কুমারী। পরস্পরের মধ্যে মিলনে, সন্তান জন্ম অবশ্যম্ভাবী। অথচ দুজনেই তখন দুজনের প্রতি প্রেমাবিষ্ট। স্বভাবতঃই ধাত্রী ও সখীদের সাহায্যেই, কুন্তী রাজা সূর্যকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।

কুন্তীর সঙ্গে, কুমারী অবস্থায় যাঁর মিলন হয়েছিল, তা যে অন্তঃপুরেই হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সমস্ত ঘটনাটিকে এমন রূপ দেওয়া হয়েছে যে, কুন্তী তাঁর রমণীয় প্রাসাদের শয্যায় উপবেশন-পূর্বক নবোদিত সূর্যের প্রাত দৃষ্টিপাত করামাত্র, সূর্যের কবচকুণ্ডল-যুগল মণ্ডিত দিব্যমূর্তি দর্শন করলেন। দুর্বাসাও ছিলেন সুধাধবল প্রাসাদে। স্বর্গ রাজ্যের অধিপতি সূর্য হয়তো কুন্তী রূপৈশ্বর্যের কথা শুনেই, কুন্তিভোজ রাজার রাজ্যে এসেছিলেন। সাক্ষাৎ যদি ধরে নেওয়া হয়, অশ্বনদীর তীরেই হয়েছিল, এবং সেখানেই দুজনে দুজনকে দেখে মুগ্ধ হন, তা হলেও, কুন্তীর সেই সাহস ছিল, প্রেমিককে তিনি অন্তঃপুরে নিয়ে যাবেন।

আমি ইতিপূর্বেই দেখেছি, কুন্তীর প্রতি সকলেই তুষ্ট। বলছেন, স্বয়ং রাজা কুন্তিভোজ। এমন কি প্রাসাদের দাসদাসী ভৃত্যসকলও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। অতএব, কুন্তীর পক্ষে রাজা সূর্যকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র অসুবিধা ছিল না। সেখানে প্রাসাদের ভিতরে, রমণীয় শয্যায়, আহারে ব্যসনে ভূষণে পরস্পরে মধ্যে প্রেম গাঢ়তর হয়েছিল। দুজনে প্রাসাদ মধ্যে কতোদিন কাটিয়েছেন, এক্ষেত্রে তার কোনো হিসাব পাওয়া কঠিন!

আমি জানি, ইতিবৃত্তের এই অধ্যায়টিকে অনেকেই সংশয়ের চোখে দেখবেন অথচ দেখার কোনো কারণ নেই। আকাশের সূর্য যে মানুষের বেশে নেমে আসতে পারে না, যে-কোনো জীবই তা অনুমান করতে পারে। কিন্তু আমি একটা বিষয় ভেবে বিস্মিত হচ্ছি। মুনি পরাশর বা দুর্বাসা, যাঁরা ছিলেন তাঁদের তপোবলে অসাধারণ ব্যক্তি, যাঁদের ক্ষমতা ছিল অসীম, যাঁরা অবিবাহিতা কন্যাদের রমণ করেও তাদের কন্যকাবস্থা দূষিত করতেন না, তাঁরা কি সেই কন্যাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন বন্ধ করার কৌশল অবগত ছিলেন না। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা কি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে

পারতেন না ? তাহলে তো কোনো সংকটই থাকতো না। এর দ্বারা এটিই প্রমাণ হয়, দেহ মিলনে সন্তান উৎপাদন বন্ধ করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। অথচ সংহিতা যুগে, কন্যারা বা ঋষি পত্নীরা যদৃচ্ছ পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতো, তখন বিধান ছিল, ঋতুকালে ষোলদিন পরে, মিলনে কোনো দোষ হতো না। এর একটাই অর্থ। ঋতুকাল থেকে ষোলদিন পরে, পুরুষ মিলনে, নারীর সন্তানসম্ভবা হবার ভয় থাকতো না।

বিষয়টি ভাবতে অবাক লাগে। সেই সংহিতা যুগেও মানুষ জানতো. স্ত্রী জরায়ুতে, ঋতুকালে যে ডিম্বাণুর আবির্ভাব ঘটতো, ঋতু স্নানের দশ দিনের আগেই ডিম্বাণুটির মৃত্যু ঘটে। অতএব, তারপরে পুরুষের শুক্রকীট জরায়ুতে প্রবেশ করলেও, ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না বলেই সন্তান ধারণেরও কোনো উপায় নেই

সংহিতা যুগেই যখন মানুষ এ বিষয়ে জানতো তখন পৌরাণিক কালের মুনি-ঋষিরা কি জানতেন না ? জানতেন। সম্ভবতঃ তাদের কন্যারমণের অভিপ্রায় ছিল, সন্তান জন্মদানই। সেদিক থেকে, যে দুজন কানীন পুত্রের কথা এই মুহূর্তেই মনে পড়ছে, আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তে, তাঁরা বিশাল ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। একজন কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণ।

সংহিতা যুগের কন্যারা (কুমারী) স্বতন্ত্রা ছিলেন, এবং যদৃচ্ছা পুরুষ-সঙ্গ করতে পারতেন, এ চিত্র আমি আগেই দেখে এসেছি। তখন তা সমাজে প্রচলিত ছিল। গোপন করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে, নতুন যুগে, কুমারীর গর্ভাধান সমাজে দোষণীয় বলে গণ্য হতো। কুন্তীর গর্ভবতী হওয়া তারই প্রমাণ।

কুমারী অবস্থায় পুরুষের যৌন সাহচর্য ভোগ করার সাহস তাঁর ছিল। আমি আগেই দেখেছি, অন্যান্য কন্যাদের তুলনায়, তাঁর শৈশবটাই শুরু হয়েছিল ভিন্ন ভাবে। দেখতেও ছিলেন বিশেষ

রূপশালিনী। এই সংবাদটি নানা দিকে প্রচারিতও ছিল। কুন্তীর নিজেরও, দেহ মিলনের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। ইতিবৃত্তের অস্পষ্টতায়, যা আমি চাক্ষুষ করতে পারছি না, তা হলো তাঁর সেই প্রিয় সূর্যসম ব্যক্তিটি কে? স্বয়ং দুর্বাসা? অথবা স্বর্গ-রাজ্যের এক অধিপতি সূর্য? আমার নিজের মনে একটি বিশ্বাস, নানা কারণেই জন্মেছে। কুন্তীর সেই পুরুষ স্বয়ং দুর্বাসাই ছিলেন। নানা যুক্তি দিয়েও এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। এবং এই সিদ্ধান্তে আসার, অনেক সংকেতও ঘটনার মধ্য দিয়ে পাচ্ছি।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুন্তীর প্রাতঃস্মরণীয়া হবার কী কারণ আছে? এই প্রশ্নের সামনে এসেই আমাকে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি দিতে হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে কুন্তী সবেমাত্র যৌবন লাভ করেছেন। আর তেজবহ্নিসম সুপুরুষ তাঁর প্রতি প্রসন্ন। দুর্বাসার মতো ব্যক্তি যে তাঁর প্রতি আসক্ত, এটাও একটা রমণীসুলভ বড় গুণ। কিন্তু ভবিষ্যতেই আমরা জানতে পারবো এ ঘটনার জন্য কেন তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতীয় রমণীগণের মধ্যে গণ্যা হয়েছিলেন।

১০

কুন্তী গর্ভবতী হলেন। যার অনিবার্য ফল, সন্তান জন্মাবেই। সেই সন্তানকে তিনি হত্যা করতে পারেন না। তেমনি নিষ্ঠুর রমণী তিনি ছিলেন না তবে তাঁর গর্ভধারণ বিষয়ে একজন মাত্র ধাত্রীই সব অবগত ছিলেন, তা সত্যি নয়। ধাত্রী, সখী, এবং বিশেষ বিশেষ অনুচররা তাঁর এই গর্ভধারণের বিষয় জানতো। তার প্রমাণও আমরা পাচ্ছি।

সমস্ত ঘটনাটি এ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে: "যথাকালে কুন্তি কনকোজ্জ্বল কুণ্ডল ও বর্মধারী, সিংহনেত্র ও বৃষস্কন্ধ এক পুত্র প্রসব করলেন। ধাত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করে, লোকলজ্জা ভয়ে মধুচ্ছিষ্টবিলিপ্ত অতি বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদন সম্পন্ন এক মঞ্জুষা, অর্থাৎ কাষ্ঠপিঞ্জর মধ্যে সেই পুত্রকে সংস্থাপনপূর্বক, কাঁদতে কাঁদতে অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করলেন। এবং পরে তিনি সহজাত কবচ দ্বারা পুত্রকে অনায়াসে চিনতে পারবেন, এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করলেন। মঞ্জুষা মধ্যগত বালক প্রবাহবেগে, অশ্বনদী, চর্মন্বত, যমুনা ভাগীরথী স্রোতস্বতীতে বাহিত হয়ে সূত রাজ্যের অন্তর্বতী চম্পা নগরীতে উপস্থিত হলো।

পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে, কুন্তী নানা কথা বলতে ক্রন্দন করেছিলেন। তবে সে-সব ক্রন্দনের ভাষা বাদ দিয়ে, তিনি যে প্রার্থনা করেছিলেন, তা হলো, "বৎস? অন্তরিক্ষগত, পৃথিবীতে, এবং দেবলোকগত প্রাণিগণ হতে তোমার মঙ্গল হোক। জলচর প্রাণিগণও তোমার কল্যাণ করুন। তোমার যাত্রপথ মঙ্গলযুক্ত হোক। কেউ যেন তোমাকে হিংসা না করে। পরিরাজ বরুণদেব ও অন্তরিক্ষ

পতি পবনদেব তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার পিতা ভাস্করদেব তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ এবং দিকপতিগণ তোমার কল্যাণবিধান করুন। তোমার সহজাত দিব্য কবচ ও কুণ্ডল দেখে, আমি যেন পরেও তোমাকে চিনতে পারি। হে দেবকুমার, যে-নারী তোমাকে স্তনপান করাবেন, তাঁর সৌভাগ্যের সীমা নেই। তোমার ন্যায় পদ্মপলাশ-লোচন শিশুকে যিনি কোলে নেবেন, যে ভাগ্যবতী যৌবনে হিমাচলবাসী সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, তোমাকে নিজের পুত্র বলে পরিচয় দেবেন, না জানি তিনি কতোই পুণ্যবতী।"

কোনো সন্দেহ নেই, কুন্তীর জীবনে, এই সন্তান ধারণ যেমন সুখের হয়েছিল, সন্তানটিকে সামাজিক কারণে ত্যাগ করাও ততোধিক দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছিল। কন্যা বলে, সেই তিনি প্রথম পুত্রের জননী প্রিয়তম সেই পুত্রকেই তাঁকে ত্যাগ করতে হলো। এটি তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা করুণ একটি বিষয়।

অতঃপর সাধারণভাবে যা জানানো হচ্ছে, তা হলো মঞ্জুষাটি ভাসতে ভাসতে গঙ্গায়, চম্পানগরীতে উপস্থিত হলো। সেই সময়ে অধিরথ-নামা সূত, পত্নী রাধাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে গমন করেছিলেন। তাঁদের চোখে পড়ল সেই মঞ্জুষা। রাধা দেখলেন, সেই মঞ্জুষা ভাসতে ভাসতে, তাঁর কাছে এসে পড়লো। ঐ মঞ্জুষা কুমকুম, দূর্বা ইত্যাদি রক্ষাদ্রব্যে সর্বাঙ্গ বিভূষিত ছিল। অধিরথ সূত পত্নী রাধা কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। তিনি মঞ্জুষাটি হাত দিয়ে ধরে, স্বামীকে ডেকে বললেন, "তুমি একবার এখানে এসে এই মঞ্জুষাটি প্রত্যক্ষ কর। এটি দেখে আমার মন কেমন চঞ্চল হচ্ছে।"

অধিরথ রাধার কথায় নিজেও কৌতূহলিত হয়ে, কাছে গিয়ে, মঞ্জুষাটি তীরে তুলে নিয়ে এলেন। দেখলেন, মঞ্জুষাটি মোম কুমকুম দূর্বা ইত্যাদি দ্বারা এমনভাবে আচ্ছাদিত রয়েছে, তাঁকে যন্ত্রের সাহায্যে

সেটি উন্মুক্ত করতেহলো। অতিসাবধানেমঞ্জুষা উন্মুক্ত করে, দেখা গেল, তার মধ্যে এক অচিরপ্রসূত শিশু শয়ান রয়েছে। শিশুটি অপূর্ব রূপলাবণ্যসম্পন্ন, তরুণ অরুণ হেমবর্মধারী কুন্তল যুগল বিভূষিত, সেই শিশুকে দেখে অধিরথ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। তাঁর অপেক্ষাও, তাঁর রূপসী উত্তম যৌবনসম্পন্না রানী রাধা এতাবৎকাল অপুত্রবতী রয়েছেন। অধিরথ রাধাকে বললেন, "প্রিয়ে আমি এমন অদ্ভুত রূপলাবণ্যযুক্ত শিশু কদাপি দর্শন করিনি। মনে হচ্ছে, শিশুটি দেবপুত্র। দেবগণ আমাদের অনপত্য দেখে, অনুগ্রহ করে, পুত্রটি দান করেছেন। এই নাও, এই পুত্র অদ্য হতে তোমার। তোমার ক্রোড়েই সে পূর্ণ-চন্দ্রের মতো বর্ধিত হবে।"
অধিরথের হাত হতে, রাধা অতি উৎফুল্ল ও স্নেহবিগলিত প্রাণে শিশুটিকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করলেন। এবং উভয়ে গৃহে ফিরে এলেন। শিশুটিকে উভয়ে ভরণ-পোষণ করতে লাগলেন। অতঃপর কিন্তু অধিরথের ঔরসে, রাধার গর্ভে তাঁদের কয়েকটি পুত্রও জন্মালো। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সেই মঞ্জুষার শিশুকে বসু (স্বর্ণ) রূপ কবচ ও কুন্দলদ্বয় সংযুক্ত দেখে, প্রথমে নাম রাখলেন, বসুষেন। কিন্তু বসু-ষেন নাম নিয়েও, শিশুটি সূতপুত্র নামেই বেশি পরিচিত হতে লাগলো। এই শিশুর অপর নাম 'বৃষ'ও রাখা হয়েছিল।

এত সব ঘটনার মধ্যে, ইতিহাস আমাদের সামনে, সামান্য একটি ঘটনা উল্লেখ করে, প্রকৃত ঘটনার সমস্ত বাস্তব রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছে। অধিরথের গৃহে, নিজের সেই শিশুপুত্রটি কেমন ভাবে মানুষ হচ্ছে, কুন্তী চর প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হতে লাগলেন।
কুন্তী তাহলে চর প্রমুখাৎ সকল সংবাদই অবগত ছিলেন? এবং পুত্রটি সুদূর বুন্দেলখণ্ড থেকে, অশ্বনদী, চর্মন্বতী, যমুনা ও গঙ্গা তীরে,

অধিরথ সূতের রাজ্যান্তবর্তী চম্পানগরীতে (অধুনা ভাগলপুর) উপস্থিত হয়েছে, সে-সংবাদও কুন্তীর জানা ছিল।

ইতিবৃত্তে বিশ্বাসী, বিবিধ নামে মানব জাতিগণের বিশ্বাস অনুযায়ী, যেমন আকাশাস্থিত সূর্য নেমে এসে কুন্তীকে গর্ভবতী করতে পারে না, তেমনি কুন্তীর বাস্তব বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও পুত্র স্নেহের কথা যদি আমরা মনে রাখি, তবে একথা বিশ্বাস করতেই হবে, তিনি গর্ভ ধারণ করার সময় থেকেই, পুত্রটিকে রক্ষা করবার বিষয়ে নানান চিন্তা করেছেন। এবং সেই চিন্তার মধ্যে, অনেক গোপনীয়তা তাঁকে অবলম্বন করতে হয়েছে, এ কথা সত্য। কিন্তু কোনো অলৌকি-কতার আশ্রয় তিনি নেন নি।

প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে, মঞ্জুষাটি যে-ভাবে নিশ্ছিদ্র রুদ্ধ করা হয়েছিল, যেটি অধিরথকে যন্ত্র দ্বারা অত্যন্ত সাবধানে খুলতে হয়েছিল, এরকম নিশ্ছিদ্র কোনো আধারে, কোনো শিশু সেই দীর্ঘপথ অনাহারে আসা কি সম্ভব ? ভগবান দিবাকরের কৃপায় সবই সম্ভব, এ বিশ্বাস যাঁদের আছে, তাঁরা সে-বিশ্বাস নিয়ে থাকুন। তাঁদের সেই স্বাধীনতা আছে। কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষ যুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে, সেখানে আমি কেন অকারণ অলৌকিক পথে যাবো ?

যুক্তির প্রশ্ন তুলতে গেলে, মঞ্জুষাটি যেমন ভাবে তৈরি হয়েছিল, তা অন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু সেই সুদূর শত যোজন জলপথ অতিক্রম করার সময়, চারটি নদী তীরবর্তী কোনো মানুষেরই মঞ্জুষাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো না ? তা ব্যতিরেকে, তীরের মানুষের কথা বাদ দিলেও, নদীপথেও কি তখন নৌকাযোগে মানুষের যাতায়াত ছিল না ?

মঞ্জুষা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই বা কী ? মঞ্জুষা—অর্থাৎ কাষ্ঠপিঞ্জর। কাষ্ঠপিঞ্জর তো এক্ষেত্রে নৌকারই নামান্তর।

এসব যুক্তিরও ঊর্ধ্বে, "কুন্তী চর প্রমুখাৎ স্বীয় পুত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হলেন।" এ কথার একটিই অর্থ, তিনি তাঁর শিশুপুত্রটিকে, একান্তই ভাগ্যের হাতে জলে ভাসিয়ে দেন। বরং দীর্ঘকাল চিন্তার পরে, একটি বিষয়ই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে কুন্তীর নিজের উদ্যোগে সদ্যোজাত শিশুকে অত্যন্ত সাবধানে যত্নের সঙ্গে অধিরথের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কুন্তী যেমন পুত্রবৎসল ছিলেন, তাঁর পক্ষে এটা করাই সম্ভব ছিল। তাছাড়া, আমি আগেই দেখেছি, দাসদাসী, ভৃত্যসকল তাঁর অত্যন্ত অনুগত ছিল। লোকবলও তাঁর ছিল। বিনা তত্ত্বাবধানে, নিশ্ছিদ্র একটি মঞ্জুষা মধ্যে, সদ্যোজাত শিশুকে জেনে শুনে তিনি একলা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন নি।

অধিরথ ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সখা। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পরিচয় সূত্রেই, রাজা কুন্তিভোজের সঙ্গে অধিরথেরও পরিচয় হবার সুযোগ থাকতেই পারে। আর কুন্তিভোজের সঙ্গে যদি অধিরথের পরিচয় ঘটে থাকে, তাহলে কুন্তীর সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এ সূত্রকে কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। বরং ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে এই পরিচয়ের ঘটনাটিই অতি বাস্তব হয়ে ওঠে।

কুন্তী যে দিন থেকে গর্ভবতী হয়েছিলেন, সেই দিন থেকেই তিনি ভবিষ্যতের সন্তানটিকে বাঁচাবার সমস্ত রকম কৌশলের কথা ভেবে-ছেন। গর্ভধান মানেই, তিনি তখন নিজেকে অন্তঃপুরের মধ্যে যতোটা সম্ভব গোপন রেখে চলেছেন। কিন্তু তাঁর কাজ তিনি বন্ধ রাখেন নি। তাঁর মনে পড়েছিল, অধিরথ সূতের পত্নী রাধার কথা, যাঁর কোনো সন্তান ছিল না অথচ সন্তানের বিশেষ আকাজ্ক্ষা ছিল। কুন্তী গৃহমধ্যে নিশ্চেষ্ট বসেছিলেন না। এবং ঠিক সেই বিশেষ দিনটিতেই চম্পানগরীর গঙ্গার ধারে, অধিরথ তাঁর পত্নী রাধাকে নিয়ে ভ্রমণ করতে আসেন নি। কুন্তী চরের মারফৎ পূর্বেই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করে, পূর্বের পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে, পত্র পাঠিয়ে-

ছিলেন। পত্রটি তিনি রাধার উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন, এবং তাঁর মতো বুদ্ধিশালিনী যুবতী পত্রের উত্তরও প্রত্যাশা করেছিলেন। রাধার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেলে, কুন্তী কদাচ তাঁর সদ্যো-জাত পুত্রকে চম্পানগরীতে পাঠাতেন না।

চরের মারফৎ সংবাদের পরেই, কুন্তী পরবর্তী করণীয় কাজগুলো সমাপ্ত করেছিলেন। বিশিষ্ট কারিগর দিয়ে, তিনি যে মঞ্জুষাটি তৈরি করিয়েছিলেন, সেটি যতোটা ছোট করে দেখানো হয়েছে, ততোটা ছোট আদৌ ছিল না। কাষ্ঠপিঞ্জরটি আসল নৌকাই ছিল। কিন্তু কারিগরীর দ্বারা তার গঠনে নিশ্চয়ই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। নিশ্ছিদ্র কোনো আধারে শিশুটিকে রাখা হয়নি। মঞ্জুষাটি আদৌ জনহীন ছিল না। চালক তো ছিলই। এই চালকের ওপরই দায়িত্ব ছিল, শিশুটিকে সময় মতো খাওয়ানো ও দেখা-শোনা করা। পানীয় জল মধু ইত্যাদি ব্যতিরেকেও তীরবর্তী অনুগামী চরের কাজ ছিল, পথিমধ্যে জনপদ হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা।

একজন অনুচরই যে তীরে তীরে মঞ্জুষাটির অনুসরণ করেছে, তাও না। নতুন অনুচর আসা মাত্র পুরনো অনুচর গিয়ে, সংবাদের প্রতীক্ষায় সদা সশংকিতা কুন্তীকে গিয়ে সংবাদ দিত। এই ভাবেই কুন্তী তাঁর সদ্যোজাত প্রিয় পুত্রটিকে লালন-পালনের জন্য অধিরথের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এবং ভবিষ্যতে পরিচয়ের সুবিধার জন্য, অভি-জ্ঞানস্বরূপ কুণ্ডল ও কবচ সঙ্গে দিয়ে দেন। ধারণ করিয়ে দেন নি। কারণ, কর্ণ বড় হয়ে, সেই কবচকুণ্ডল ধারণ করতেন। এর একটাই অর্থ, কুন্তী কর্ণের যৌবনের দেহ অনুমান করেই, কবচকুণ্ডল যুগল তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং এই কবচকুণ্ডলের কথাও অধিরথ ও রাধাকে পূর্বেই জানানো হয়েছিল। কারণ পরে আমি দেখছি, কবচকুণ্ডলের ঐ দিব্যলক্ষণ দ্বারা, কুন্তী স্বীয় পুত্র কর্ণকে রঙ্গভূমিতে চিনতে পারেন। কর্ণকে দুর্যোধন কর্তৃক রঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করায়,

পরম স্নেহে, গোপনে, মনে মনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করছেন।

কর্ণের জন্মকে কেন্দ্র করে, একটা গোপনীয়তার আশ্রয়েরপ্রয়োজন ছিল। সময়টা আর সংহিতা যুগ ছিল না। অতএব, স্বতন্ত্র হলেও, কোনো কুমারী কন্যা যদৃচ্ছা পুরুষে আসক্ত হতে পারতো না। তবে ঘটনাটা সেই সংহিতা যুগের কন্যাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। পৌরাণিক কালে আর তা সম্ভব ছিল না বলেই, কুন্তীকে তাঁর সদ্যো-জাত শিশুকে লালন-পালন করার জন্য, লোকসমাজে অপ্রকাশিত রাখার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তা কতোটা কার্যকরী হয়েছিল!

অধিরথের কথা এখানে ছেড়েই দিচ্ছি। তিনি সবই জানতেন দেখছি, ব্যাসদেব, ভীষ্মদেব, বাসুদেব, এঁরা তিনজনেই বিশেষ ভাবে সমস্ত বিষয়টি পরিজ্ঞাত ছিলেন। তবে বাসুদেব নিশ্চয়ই পরে জেনেছিলেন। কারণ, তিনি কর্ণের পরে জন্মেছেন। কিন্তু অল্প বয়সেই, নিজের দূর-দৃষ্টির দ্বারা অবগত হয়েছিলেন।

কর্ণের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে জনশ্রুতিও কিছুটা প্রচলিত ছিল, এটা প্রায় সুনিশ্চিত। দুর্যোধন কর্ণের জন্ম-রহস্য সম্পর্কে কিছু জানতেন কিনা, মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও, স্পষ্টই বলেছেন, "যেমন, হরিণীর গর্ভে বাঘের জন্ম হওয়া একান্তই অসম্ভব, কবচ ও কুণ্ডল-ধারী সর্বলক্ষণ সংযুক্ত সূর্যসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণও তদ্রূপ সামান্য ব্যক্তির ঔরসে বা সামান্য নারীর গর্ভে জন্মান নি।"

এই দুর্যোধন আর এক জায়গায় মদ্ররাজ শল্যকে বলেছেন, "যদি কর্ণের কিছুমাত্র দোষ থাকতো, তা হলে মহর্ষি পরশুরাম কখনোই তাঁকে দিব্যাস্ত্রজালসকল দান করতেন না। এই জন্যেই আমি কর্ণকে সূতোকুলোদ্ভব বলে বিবেচনা করি না। আমি মনে করি, ইনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার, মহৎ গোত্র সম্পন্ন। উনি কখনোই সূত

কুল সম্ভূত নন।"

দুর্যোধনের এসব দৃঢ়বাক্য থেকে মনে হয়, তিনি কর্ণ-জন্ম-রহস্য সম্পর্কে হয়তো কিছু জানতেন। স্বয়ং পরশুরাম যদি তাঁকে কিছু নাও বলে থাকেন, দ্রোণাচার্য বলতে পারেন। কারণ, দ্রোণকে পরশুরাম অতি ভয়ংকর অস্ত্রসকল দান করেছিলেন। দুর্যোধনের কথায় এক জায়গায় বলা হয়েছে, কর্ণ 'ক্ষত্রিয়কুল প্রসূত দেব-কুমার'। তাঁর এ ধারণায়, এটাই যেন প্রমাণ হয়, স্বর্গরাজ্যের অধি-পতি সূর্যের ঔরসেই কর্ণের জন্ম হয়েছিল।

যুধিষ্ঠিরের মনেও কর্ণকে নিয়ে নানারকম সন্দেহ ছিল। কর্ণ অর্জুনের হাতে নিহত হবার পর, তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, "দ্যূতক্রীড়ার সময়ে মহাবীর কর্ণ দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে আমাকে অনেকানেক কটুবাক্য বলেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে কোনো খারাপ কথা বলতে পারিনি। আমার মনে প্রচণ্ড রাগ হতো। তখন তাঁর পায়ের দিকে তাকালে, আমার সমস্ত রাগ পড়ে যেতো। কারণ, ঐ মহাবীরের পা দুটি, আমার মা কুন্তীর চরণ যুগলের মতো দেখতে ছিল। আমি চরণযুগলের এই সাদৃশ্যের আগে অনেকবার জানবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো দিনই তার সন্ধান পাই নি।"

শুধু তা-ই না। যুধিষ্ঠিরও সকলের মতোই শুনেছিলেন, কর্ণ সূতো-কুলোদ্ভূত। কিন্তু কর্ণকে সহজাত কবচ ও কুণ্ডলধারী দেখে, মনে করতেন, ঐ ব্যক্তিকে যুদ্ধে হত্যা করা অসম্ভব। এমন ভয়ও পেয়ে-ছিলেন, তেরো বছর কর্ণের কথা ভেবে, ভালো করে ঘুমোতেও পারেন নি। আসলে তাঁর মনে একটি বিশেষ সন্দেহ ছিল, কর্ণ আদপেই একজন সূতোকুলোদ্ভূত সন্তান নন। এবং লোকসমাজে প্রকাশ না করলেও, কর্ণের চরণযুগলের সঙ্গে নিজের জননী কুন্তীর চরণযুগলের বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যে-সন্দেহ তাঁর মনে উদিত হতো, নিজের জননী সম্পর্কে তেমন সন্দেহ করা পাপ বলে

মনে করতেন।

ইতিহাসের পথপরিক্রমায়, আমি কুন্তীর জীবনের কন্যকাবস্থার সবই প্রত্যক্ষ করলাম। কেবল অস্পষ্টতা থেকে গেল একটি বিষয়ে। যদিও ইতিহাসের সংকেত মতো, দুর্বাসাকেই আমি কর্ণের পিতা বলে মনে করি। স্বর্গ রাজ্যের সূর্যের সঙ্গে কুন্তীর সাক্ষাতের কোনো ইঙ্গিত পাই নি। সেই দেবরাজ সূর্যের রূপেরও কোনো বর্ণনা নেই। অথচ দুর্বাসার রূপের বর্ণনায় বারে বারেই এই গ্রহের সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন, শেষবারের মতো, দুর্বাসার রূপের আর একটি বর্ণনা আমি দিচ্ছি : রুদ্রস্বরূপ দুর্বাসার দেহপ্রভা গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের ন্যায় জাজ্বল্যমান থাকতো এবং তিনি প্রতপ্ত সুবর্ণসদৃশ জটাভারে সুশোভিত ছিলেন।

দুর্বাসার রূপের এ বর্ণনা থেকে, তাঁকে সূর্য-সদৃশ পুরুষই বলতে হয়। আমি কুন্তীকেও দেখেছি, তিনি সেই সূর্য-সদৃশ রূপবান ঋষিকে সেবা করে নিজে সুখী ছিলেন। দুর্বাসাকেও সুখী করেছিলেন। তারই পরিণতিস্বরূপ, কর্ণের মতো পুত্র লাভ। আমি ইতিমধ্যেই অনেক-বারই দেখেছি, কুন্তী কন্যকা জীবনে দৈহিক সুখ যেমন ভোগ করে-ছেন, সন্তান ত্যাগ করতে গিয়ে, ততোধিক দুঃখ পেয়েছেন।

কুন্তীর নারী জীবনের বৈচিত্র্যও এটাই। যে পঞ্চকন্যাকে নিয়ে আমাদের ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে গর্ববোধ করেছে, তাঁদের মধ্যে কুন্তীর জীবনই যেন সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুঃখী। এখন আমি কুন্তীর জীবনের সেই অধ্যায়ে যাত্রা করবো।

১১

কুন্তী তাঁর পরবর্তীজীবনে, যখন কৃষ্ণকে দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, শৈশবে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চনা দিয়েই জীবন শুরু হয়েছিল, তখন তিনি আরও কয়েকটি কথা বলেছিলেন, "·· শ্বশুরকুলেও ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রাদির দ্বারা আমি লাঞ্ছিত হয়েছি। কৃষ্ণ ! আমার মতো দুঃখীর বেঁচে থাকার আর কী প্রয়োজন ?"···

শ্বশুরকুলের কথা বলতে গিয়ে, সে সময় তিনি স্বামী পাণ্ডুর উল্লেখ করেননি। কৃষ্ণ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, সমস্ত বিষয়ে নীতিবিশারদ। তথাপি তিনি কুন্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র। হয়তো সেই কারণেই তাঁর দাম্পত্যজীবনের কথা কৃষ্ণকে বলতে পারেননি। প্রথম জীবনে কন্যকাবস্থায় পুত্রলাভ ও পুত্রকে ত্যাগ করা, কোনো কথাই লজ্জায় বলতে পারেননি। কিন্তু শ্বশুরকুলে, কুন্তী কী লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন ?

দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময় ভীষ্মের ও ধৃতরাষ্ট্রের আচরণে তিনি মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন। পুত্রবধূর লাঞ্ছনা, তাঁরও মানসিক লাঞ্ছনার বিষয়। কিন্তু 'শ্বশুরের দ্বারাও লাঞ্ছিত হয়েছি' এ অভি-যোগটি যেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই তাঁর নিজের বিষয়ে বলেছেন। কেন ?

কারণ নিশ্চয়ই ছিল।

আমি যে-নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছি, সেখানেই তার জবাব নিহিত আছে। চম্পানগরীতে অধিরথ সূতের কাছে কর্ণকে পাঠিয়ে, কুন্তী অনেকটা আশ্বস্ত ছিলেন। পুত্র ত্যাগের কষ্ট দূর হয় নি। তা সম্ভবও ছিল না। তবে, রাজা কুন্তীভোজের কন্যা কুন্তী যে এক অসাধারণ সুন্দরী রাজপুত্রী, এ বিষয়টি দেখছি, বেশ ভালো ভাবেই প্রচারিত

ছিল। রাজা তো দেখছি, অনেক বর্তমান। তাঁদের অনেকের কন্যা থাকা সত্ত্বেও, কুন্তীর রূপৈশ্বর্যের যে-প্রচার ছিল, তেমনটি কারোরই দেখছি না। আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিচ্ছিল। বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা সকলেই কুন্তীকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠাচ্ছিলেন রাজা কুন্তিভোজকে।

রাজা কুন্তি ভোজ পড়লেন মুশকিলে। সব রাজ্যের পরাক্রমশালী রাজারাই কুন্তীর পাণিপ্রার্থী। বিশেষ কোন্ একজন রাজাকে তিনি কুন্তীকে সম্প্রদান করবেন? এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যখন অসম্ভব হলো, তখন তিনি আত্মীয় বান্ধব অমাত্য, সকলের সঙ্গে আলোচনা করে, কুন্তীর বিয়ের জন্য স্বয়ংবরসভা আহ্বান করা স্থির করলেন। এবং আহ্বানও করলেন।

এই স্বয়ংবর সভায় কুরুবংশের রাজা পাণ্ডুকেও দেখছি। ইতিহাসের পাতায়, পাণ্ডুর রূপের বর্ণনা দেখছি, তিনি স্বয়ংবর সভায়: সূর্যসদৃশ স্বীয় অনুপম প্রভাব দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা ম্লান করে দিয়ে বসে আছেন। তাঁর কারণ প্রতাপ সিংহের মতো, বক্ষদেশ কষণ-সদৃশ প্রশস্ত, নয়নযুগল পদ্মসদৃশ। মহারাজ পাণ্ডুকে দেখলে, স্পষ্ট বোধহয়, যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র স্বর্গ ছেড়ে কুন্তীকে পাবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন।' বলাবাহুল্য, কুন্তী সেই মহাতেজা পুরুষকে দর্শন করে, তাঁর গলাতেই মাল্যদান করলেন।

এই মাল্যদানের সময়, কুন্তীর কি দক্ষিণ চক্ষু কম্পিত হয়েছিল?' কোনো অশুভ ভাবনা কি তাঁর মনে উদয় হয়েছিল? বস্তুতপক্ষে, পাণ্ডুর রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার কতোটাই বা সত্য? যাঁর ওরকম সিংহের মতো প্রতাপ আর সূর্যসম কান্তি, অথচ জন্মের সময় থেকেই দেখছি, তিনি একজন পাণ্ডুবর্ণের পুরুষ। ইতিহাস রূপকথা না। ব্যাসদেবের ঔরসে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়ে জন্মেছিলেন। কারণ, তাঁর মা ব্যাসদেবকে দেখে ভয়ে চোখ বুজেছিলেন। ইতিহাস

যুক্তি চায়। মা গর্ভধারণের জন্য, ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে যেহেতু ভয়ে চোখ বুজেছিলেন, সেই হেতু সন্তান অন্ধ হয়ে জন্মেছিল, এ কথা বিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। যেমন পাণ্ডুর জন্মের আগেই তাঁর জননী ব্যাসদেবকে দেখে, ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিলেন, সেই কারণে গর্ভের সন্তানও পাণ্ডুর বর্ণ হয়েছিল। এও কোনো যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা না। আপাততঃ ত্রুটির সন্ধান করতে গিয়ে, আমি এই মুহূর্তে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তবে, আমি একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু স্বাভাবিক সুস্থ পুরুষ ছিলেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব বিষয়ে,দেখছি কেউকেউ তাঁর বিষয়েও স্নেহান্ধতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। এসব হলো ইতিহাসের পাতাকে দূষিত করার চেষ্টা। ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃতই অন্ধ হয়ে জন্মেছিলেন। সে ত্রুটি কার ছিল? অম্বিকার? না ব্যাসদেবের? যে বিচিত্রবীর্য ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতা ছিলেন (পৈতৃক পরিচয়ের দিক থেকে) সেই বিচিত্রবীর্যের দ্বারা কি তাঁর দুই পত্নী কোনোরূপ অসুস্থ হয়েছিলেন? ইতিহাস বলছে, বিচিত্রবীর্য দুই পত্নীর সঙ্গে অতিরিক্ত দৈহিক সম্ভোগের কারণে, যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। বিচিত্রবীর্য নামের মধ্যে কি বিশেষ কোনো অর্থ আছে? রূপবান সুপুরুষকে কি বিচিত্রবীর্য বলা যেতে পারে?

এই সব জিজ্ঞাসার মধ্যে কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার। দুই পত্নীর তুলনায়, বিচিত্রবীর্য বয়সে বেশ ছোট ছিলেন। এবং ছিলেন অত্যন্ত কামুক। ইতিহাসের নীরবতার অর্থ এই না, ইতিবৃত্তের অন্তরালের ঘটনাবলীকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা থাকবে না। বিচিত্রবীর্য কি অন্যান্য নারীতেও আসক্ত ছিলেন? যৌনব্যাধি পৃথিবীর মানব সমাজে এই প্রাচীন অভিশাপ। বিচিত্রবীর্য যদি কোনো ব্যাধি তাঁর দুই পত্নীকে দান করে গিয়ে থাকেন, সেটা খুব একটা আশ্চর্যের

বিষয় না।

আরও দুটি বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বেদব্যাস যে দাসীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, সেই বিদুর নিরোগ স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর কোনো শারীরিক ত্রুটি ছিল না। বেদব্যাস এক শূদ্রার গর্ভে তাঁর পুত্র শুকদেবকে জন্ম দিয়েছিলেন। তিনিও সুস্থ ছিলেন। অথচ ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু অস্বাভাবিক ত্রুটিপূর্ণ দুটি সন্তান। আরও লক্ষণীয়, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মের পর, অম্বিকা ও অম্বালিকার বিষয়ে আমি আর বিশেষ কোনো সংবাদই পাচ্ছি না যেন, ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুকে জন্মদান করা ছাড়া,তাঁদের আর কোনো ভূমিকা ছিল না! হয় তো বাস্তবিকই তা ছিল না।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। কিন্তু পুত্রোৎপাদনে অক্ষম ছিলেন না। গান্ধারীর দীর্ঘকাল গর্ভধারণ, পিণ্ড প্রসব, তা থেকে একমাত্র পুত্রের জন্ম, এসব নিয়ে আপাততঃ আমার কোনো দরকার নেই। গান্ধারী ছাড়াও, তিনি দাসীর গর্ভে দুটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। বোঝা যায় অন্ধ হলেও সন্তান জন্মদানে তিনি সক্ষম ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডু ?

'অন্তিম প্রণয়' কাহিনীতে আমি পাণ্ডুর প্রশ্ন তুলেছিলাম। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়া সত্ত্বেও, রাজা হতে পারেন নি। রাজা হয়েছিলেন পাণ্ডু। ভীষ্ম, ব্যাসদেব, এবং এমন কি ধৃতরাষ্ট্রও কি জানতেন না, পাণ্ডু প্রকৃতপক্ষে ত্রুটিহীন পুরুষ নন ? তাঁর যে রূপ ও স্বাস্থ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে পাণ্ডুবর্ণের যোগাযোগ ঘটায় তিনি যথার্থই কেমন দেখতে ছিলেন, তার সঠিক কিছু ব্যক্ত করা যায় নি।

কুন্তী কি সত্যি পাণ্ডুর পরিচয় না জেনে, নিতান্ত চেহারা দেখে মুগ্ধহয়েই তাঁর গলায় মাল্যদান করেছিলেন? অথবা তিনি জানতেন সেই যুগের কুরুবংশের মহারাজা পাণ্ডুই ছিলেন শ্রেষ্ঠ নরপতি ?

সম্ভবতঃ এটাই সত্য। তিনি যদি পাণ্ডু সম্পর্কে আরও কিছু জানতেন তা হলে হয়তো সেই শুভ দিন, শুভ মুহূর্তটিতে পাণ্ডুর গলায় মালা পরাতেন না।

এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হবার আগে, আমি পাণ্ডুর জীবনের কয়েকটি পাতা উল্‌টে দেখতে চাই। পাণ্ডু বীর এবং যোদ্ধা ছিলেন। কুন্তীর মাল্যদানের পর রাজা কুন্তিভোজ উভয়ের বেদবিহিতানুসারে বিয়ে দিলেন। আর দিলেন প্রচুর ধনসম্পত্তি। পাণ্ডু অসংখ্য ধ্বজপতাকা-যুক্ত সৈন্য সমভিব্যহারে হস্তিনায় প্রবেশ করলেন। তার মানে, স্বয়ংবরে যাবার সময়, পাণ্ডু সৈন্য সামন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। এ বিয়ের উৎসবে, হস্তিনার কোনো রাজপুরুষকেই দেখছি না ? আবার, তার-পরেই দেখছি ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র সবাই বেশ উৎসাহের সঙ্গে, পাণ্ডুকে আবার রাজা শল্যের ভগ্নি মাদ্রীর বিয়ে দিলেন।

কুন্তী আর মাদ্রীকে বিয়ে করার পরে, পাণ্ডু হস্তিনা প্রাসাদে কতো দিন বাস করেছিলেন? ইতিহাস এখানেও কেমন একটি অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। কোথাও বলা হয়েছে, কুন্তী ও মাদ্রীকে বিয়ে করার পর, তিনি কিছুকাল হস্তিনায় বাস করেছিলেন। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, দুই পত্নীসহ পাণ্ডু হস্তিনা প্রাসাদে এক মাস বাস করে-ছিলেন। কিছুকাল আর এক মাস, এক কথা নয়। একমাস বলার মধ্যে কোনো যুক্তি পাওয়া যায় না। ঠিক মাস গণনা করা কঠিন। কিন্তু কালটাই ঠিক। একমাস হতে পারে। মাসাধিককাল হতে পারে। আবার এক মাসের কমও হতে পারে। ঐতিহাসিক ইচ্ছা করেই, এই প্রচ্ছন্নতা বজায় রেখেছেন। আরও একটি প্রশ্ন মনে জাগে। কুন্তীকে বিয়ে করে তিনি হস্তিনা নগরে ফিরলেন। তারপরে বাহ্লীক—অর্থাৎ পাঞ্জাবের দুহিতা মাদ্রীকে বিয়ে করলেন। এ দুই বিষয়ের মধ্যে, কতো দিনের ব্যবধান ছিল, তা কিছুই জানা যায় না। শুধু একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কুন্তী আর মাদ্রীর মতো

ছুটি যুবতী পত্নীর সঙ্গে, পাণ্ডুর মিলন ঘটে নি। অথবা, যদি ধরেও নিই, মিলন ঘটেছিল, তবু এমন প্রত্যাশা করা যায় না, সেই সময়ের মিলনেই, কুন্তী বা মাদ্রী গর্ভবতী হবেনই।

তারপরে দেখছি, পাণ্ডু দুই পত্নীকে রেখে, বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হলেন। এ যুদ্ধ-যাত্রার প্রয়োজনও ছিল। রাজা শান্তনুর তেমন যুদ্ধাভিযানের সংবাদ ইতিহাসে নেই। ভীষ্মও তেমন যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন নি। কিন্তু আশেপাশের অনেক রাজ্য, কুরুবংশের বেশ ক্ষতি করেছিল। পাণ্ডু যুদ্ধযাত্রা করে, দর্শন দেশ প্রথম জয় করেন। তারপরে মগধ, মিথিলা, কাশী, সুহ্ম ও পুণ্ড্র জয় করেন। তা ছাড়াও আরও অনেক দেশ জয় করে, কুরু-বংশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন। এবং রাজ্যগুলো জয় করে যে-সব ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন, তা ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, সত্যবতী, নিজের মা ও ছোট ভাই বিদুরকে দান করেছিলেন।

এ সবই ইতিহাসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কিন্তু দিগ্বিজয় করে, বহু অর্থ ধনসম্পত্তি নিয়ে ফিরে এসে, রাজা হিসাবে দেশ শাসন করার পরিবর্তে, দুই পত্নীকে নিয়ে পাণ্ডু হঠাৎ বনে গমন করলেন কেন? ইতিহাস এ বিষয়ে একেবারে নীরব। অথচ, এখন পাণ্ডুর হঠাৎ বনে গমন একেবারেই যুক্তিহীন। অথবা, বুঝতে হবে, হস্তিনা নগরী ও প্রাসাদে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল, পাণ্ডু রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ কারণটি যদি বাদ দিই, তবে কি বুঝবো পাণ্ডু বৈরাগ্যবশতঃই বনবাসে গিয়েছিলেন?

তারপরেই দেখছি, সেই অতি পুরাতন অসার একটি কাহিনী। কিমদ্দক নামে এক ঋষি, বনের মধ্যে হরিণীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত ছিলেন। বলা হয়েছে, হরিণীটি কিমদ্দক ঋষির পত্নী। কোনো নাম নেই। ঋষির কুটিরে যেহেতু জায়গা নেই সেই হেতু জঙ্গলের মধ্যে স্বামীস্ত্রী হরিণের বেশ ধরে রমণে লিপ্ত হয়েছিলেন। আবার সেই

অযৌক্তিক কাহিনীর অবতারণা। ভূতের গল্পের মতো, ভূতের নানা প্রাণীর বেশ ধারণ। কিন্তু ভৌতিক কাহিনী আর ইতিহাস এক বস্তু না। কোনো মুনি-ঋষিই কখনও কোনো প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারেন না। তবে পশুমৈথুন সম্ভব হতে পারে। কিমন্দক হয় তো কোনো হরিণীর সঙ্গে মৈথুনে লিপ্ত হয়েছিলেন। পাণ্ডু মৃগয়ায় বেরিয়ে, সেই অবস্থায় দুজনকেই তীর বিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন।

কিমন্দক পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, পাণ্ডুও যখন স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত হতে যাবেন, তখন তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

ইতিহাসে অভিশাপের ঘটনাগুলোকে ঐশী শক্তির দ্বারা প্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অভিশাপের মধ্যে কোনো ঐশী শক্তি নেই। অলৌকিকতাও নেই। যা আছে, তা হলো, সেই যুগে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জ্যোতিষী বা অন্য কোনো গুণের প্রভাবে ভবিষ্য-দ্বাণী করতে পারতেন। কিন্তু কিমন্দক মুনির হরিণ বেশে মৈথুন, পাণ্ডুর মৃগহত্যা, অভিশাপ, সবটাই অবাস্তব বোধহয়। কাহিনীটি আগাগোড়া সাজানো। এবং অবশ্যই তার উদ্দেশ্যও রয়েছে।

পাণ্ডু যখন কুন্তী ও মাদ্রীর মতো দুই হস্তিনীর মধ্যে বিশাল হস্তীর ন্যায় বনে মহানন্দে ভ্রমণ করছিলেন, তখন হস্তিনায় বিদুরের বিয়ে হয়। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে দাসী বা বৈশ্যা পত্নীর গর্ভে যুযুৎসুর জন্ম হয়। গান্ধারীর গর্ভে দুঃশলা নামে এক কন্যারও জন্ম হয়।

হস্তিনা নগরে এত ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের দাসীর গর্ভে ছেলে হলো। গান্ধার প্রসব করলেন এক কন্যা। আর হস্তীর ন্যায় বিশাল তেজস্বীপুরুষ পাণ্ডু দুই পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান উৎপাদন করতে পারলেন না ? যদি দেখতাম, এসব ঘটনা ঘটবার আগেই, কিমন্দক মুনির অভিশাপের ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে, তা হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু যুযুৎসু আর দুঃশলার জন্মও বিদুরের বিয়ের

পরে, অভিশাপের ঘটনাটি ঘটলো।

প্রকৃতপক্ষে অভিশাপের ঘটনাটি হয় প্রক্ষিপ্ত। অন্যথায় স্বয়ং ব্যাস দেব কুরুবংশের রাজাকে ক্লীব দেখাতে চান নি বলেই এরকম একটি কাহিনীর অবতারণা করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, পাণ্ডু যতোই বলশালী পুরুষ হোন, তিনি ছিলেন অসুস্থ। কেবল মৃত শুক্রের ধারক ছিলেন না। তাঁর এমন কোনো ব্যাধি ছিল, যে ব্যাধির কারণে নারী সঙ্গমে লিপ্ত হলেই, মৃত্যু ছিল অবধারিত। অভিশপ্ত হবার আগে দুই পত্নীকে গর্ভবতী করার মতো সময় তিনি অনেক পেয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি। ইতিহাস অলক্ষ্য থেকে, নীরবেই তার প্রমাণ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে কুন্তীর, শ্বশুরকুলের লাঞ্ছনার কথাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। শ্বশুরকুলের লাঞ্ছনা বলতে তিনি ভীষ্মকে, বেদব্যাসকে, যুদ্ধ বা দ্রৌপদী লাঞ্ছনার জন্য দায়ী করেন নি। শ্বশুরকুলের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রকেও ধরা হয়েছে।

কুন্তী বিয়ের পর, হস্তিনা নগরের প্রাসাদেই পাণ্ডুর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি স্বয়ংবর সভায় যে-বীর পুরুষকে মাল্যদান করেছিলেন, স্বভাবতই তাঁর প্রত্যাশা ছিল, স্বামী সহবাসের দ্বারা অচিরাৎ সুখী হবেন। তাঁর কন্যকাবস্থার পুত্রকে যেহেতু নিজে লালন-পালন করতে পারেন নি, সেই হেতু তিনি স্বাভাবিক কারণেই, দেহে মনে অতি পুত্রার্থিনী হয়েছিলন। অথচ সেই প্রত্যাশিত মিলন ঘটেনি। তারপরেই আবার মাদ্রীর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা তাঁকে অবাক করেছিল। দুঃখও দিয়েছিল। ভেবেছিলেন, বাহীক কন্যা, মাদ্রীকেই হয়তো মহারাজ বেশি পচ্ছন্দ করেন। কিন্তু কুন্তী দেখেছিলেন পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গেও সহবাসে লিপ্ত হন নি। পাণ্ডু যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। ফিরে এসে, হস্তিনা ত্যাগ করে বনে গমন।

কুন্তী বনবাসকালেই প্রথম নিশ্চিত বুঝতে পারলেন, বাইরে থেকে

যে-পুরুষকে তিনি সূর্যসম উজ্জ্বল বলশালী দেখিয়েছিলেন, প্রকৃত-পক্ষে তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। মৃগয়ায় গিয়ে যিনি অক্লেশে ব্যাঘ্র সিংহ হত্যা করেন, সেই তিনি স্ত্রী সহবাসে অক্ষম। "শ্বশুরের দ্বারাও লাঞ্ছিত হয়েছি" কুন্তীর এই কথার একটিই অর্থ হয়। ভীষ্ম বেদব্যাস, এমন কি তাঁর ভাসুর ধৃতরাষ্ট্রও জানতেন, পাণ্ডুর বিবাহ অনুচিত। তাঁর স্ত্রী গ্রহণ করা নিষ্ফল হবে। এসব জেনেও তাঁরা পাণ্ডুকে কুন্তীর স্বয়ংবর সভায় যেতে নিষেধ করেন নি। উপরন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শল্য-ভগ্নী মাদ্রীরও ক্ষতি করেছিলেন।

পাণ্ডুর সঙ্গে বনবাসকালে, কুন্তী মাদ্রী প্রকৃতপক্ষে বৈধব্য জীবন যাপন করেছিলেন। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি; কিমদ্দকের ঘটনা একটি কল্পিত অবাস্তব কাহিনী মাত্র। পাণ্ডু কুন্তীর কাছে সত্য প্রকাশে বাধ্য হলেন। তিনি কুন্তীকে বললেন, "মহারানী আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতোই জন্ম থেকে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। আমি বৃথাই বীরত্ব প্রদর্শন করি। এখন থেকে আমি সাত্ত্বিক জীবন-যাপন করবো। আমি আমার সমস্ত রাজপোশাক হস্তিনায় পাঠিয়ে দেবো। তোমাদের নিয়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে গিয়ে তপস্যায় রত হবো। তবে তোমাদের আমি আমার সঙ্গে, আমার মতো জীবন-যাপন করতে দিতে চাই না।"

পাণ্ডুর শেষের কথাটি যে কুন্তী মানবেন না, তা জানাই ছিল। কুন্তী তাঁর দুঃখের কারণসমূহ সকলই অবগত হয়েছিলেন। এবং পাণ্ডুকে বলেছিলেন, "আমি ও মাদ্রী, আপনার সঙ্গে, আপনার মতোই জীবন-যাপন করবো। আমরাও আপনার মতো তপস্যায় নিরত হবো। ব্রহ্মচর্য পালন করবো।"

পাণ্ডুর যে-ব্যাধিই থাক, তথাপি তিনি ছিলেন কুরুবংশের রাজা

তিনিই কি বৈরাগ্য নিয়েই, দুই পত্নীসহ হস্তিনা ত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন ? না কি আরও গভীর কোনো কারণ ছিল।

থাকাই স্বাভাবিক। তিনি জানতেন, তাঁর কোনো সন্তানাদি হবে না। হস্তিনায় থেকে, তাঁকে দেখতে হবে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র কুরু সিংহাসনে বসবে। তার চেয়ে পত্নীদের নিয়ে বনগমন শ্রেয়ঃ। সেখানেই তাঁকে ভাবতে হবে, ভবিষ্যতের জন্য কী করা যায়। অথবা, তিনি তখনই ক্ষেত্রজ সন্তানের কথা ভেবেছিলেন। হস্তিনায় থেকে, ক্ষেত্রজ সন্তান পাওয়া তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন ছিল। আর কেউ বাধা না দিলেও, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর সঙ্গীরা বাধা দিতেন। কেন না, ইতিহাসে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, কুন্তী ও মাদ্রীর পরে, আর কোনো রানীই ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম দেন নি। এর একটাই কারণ। সমাজে সেই সময়ে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতএব, হস্তিনায় থাকলে, পাণ্ডু ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করতে পারতেন না। অথচ, তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন, তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্ররা, তাঁর নামে সিংহাসনের দাবীদার হবে। রাজা হবে।

ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্য শতশৃঙ্গ পর্বতে যেতে হলো কেন ?

শতশৃঙ্গ পর্বতে অনেক মুনি ঋষিগণ তপস্যা করতেন। পাণ্ডু তাঁদের সহায়তা চেয়েছিলেন। সেই সব মুনি ঋষিরা যেন ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের সম্মতি দেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁদের সঙ্গে পাণ্ডুর বিশেষ হৃদ্যতা জন্মালো। তাঁরা পাণ্ডুর মনোগত বাসনার কথা জেনে, বললেন, "যাঁর পুত্র নেই, তিনি পিতৃঋণে আবদ্ধ থাকেন। অতএব পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য তাঁর পুত্রোৎপাদন অবশ্য কর্তব্য। পিতৃঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু পাত্রর নিজের পক্ষে যখন পুত্রোৎপাদন সম্ভব না, তিনি প্রাচীন মতানুসারে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করতে পারেন। ব্রাহ্মণরা যখন এই নিদান দিলেন, তখন পাণ্ডুর মনে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলো না। তিনি প্রথম

অনুরোধ নিয়ে কুন্তীর কাছে গেলেন।

কুন্তী কানীন পুত্রের জননী। তিনি জানতেন, সমাজে সেটি একটি গর্হিত অন্যায় কাজ, সেই কারণে তিনি পুত্র স্নেহ থেকে বঞ্চিত। ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনও অরুচিত। কুন্তী প্রথমে বললেন, "মহারাজ, আপনি আমার সঙ্গেই সহবাসে লিপ্ত হোন। আপনার সঙ্গে আমিও স্বর্গে যাবো।"

বস্তুতপক্ষে এ কথা কুন্তী আদৌ বলতেই পারেন না। পুত্র লাভের জন্য, স্বামী প্রাণ হারাবেন, তিনি তা কখনও চান নি। বরং তিনি বহু পূর্বের কুরু বংশেরই রাজা ব্যুষিতাশ্বের জীবনের ঘটনা বলেছিলেন। ব্যুষিতাশ্ব আপন শক্তিতে বিশাল রাজ্য সৃষ্টি করেও, সহসা অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মহিষী ভদ্রা প্রাণত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আকাশবাণী শুনেছিলেন, ব্যুষিতাশ্ব বলেছিলেন, তিনি স্বয়ং তাঁর শবদেহে আবির্ভূত হয়ে, স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করবেন।

ব্যুষিতাশ্ব ভদ্রার গর্ভে তিনজন শাল্ব ও চারজন মদ্রের জন্ম দিয়েছিলেন। কুন্তী এই কাহিনী শুনিয়ে, পাণ্ডুকে বললেন, "আপনি এভাবে আমার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, আমার সতীত্ব রক্ষা করুন।"

পাণ্ডু জানতেন, ঘটনাটি অবাস্তব। অতএব, তিনি কুন্তীকে বোঝাবার জন্য বললেন, "রাজা ব্যুষিতাশ্ব ছিলেন দেবতুল্য মানুষ। তিনি যা পারতেন, আমি তা পারি না।" এই বলে তিনি কুন্তীকে সংহিতা যুগের কথা শোনালেন, নারী পুরুষ যদৃচ্ছা স্ব স্ব জাতিতে মিলিত হলে কোনো দোষ হতো না। উত্তর কুরুতে (সাইবেরিয়ায়) এখনও সে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। তিনি তখন তাঁর নিজের জন্মের কথাও শোনালেন।

কুন্তী শেষ পর্যন্ত সম্মত হলেন। শুধু সম্মত হলেন না। কুমারী

অবস্থায়, দুর্বাসার সেবার জন্য তিনি যে বর হিসেবে বিশেষ মন্ত্র-প্রাপ্ত হয়ে, যে-কোনো দেবতাকে ডেকে নিজের অভিলাষ পূরণ করতে পারেন, সে-কথাও বলতে ভুললেন না। কিন্তু কর্ণের জন্মের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না। জীবনে কোনো কালেই স্বামীর কাছে তিনি তা প্রকাশ করেন নি।

১২

এইখানে এসে, ইতিহাসের ধূলাচ্ছন্ন পাতায় আমাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করতে হচ্ছে। কুন্তীর জীবনের এটা একটা বড় বেদনাদায়ক ঘটনা, কোনো সন্দেহ নেই। কন্যকাবস্থায় পুত্র জন্ম দিয়ে, তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। আজ স্বামী বর্তমান থাকলেও, অন্য পুরুষের দ্বারা তাঁকে গর্ভধারণ করতে হবে। পুত্রের জন্ম দিতে হবে।

ইতিহাসের পাতায় নানা কথার সৃষ্টি করা হয়েছে। সে সব যে একান্তই সত্য, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। যেমন, কুন্তী পাণ্ডুকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দেবতাকে ডেকে তিনি গর্ভধারণ করবেন। কুন্তী পাণ্ডুকে ভালবাসেন, অথবা করুণা করেন, সেটা ভাববার বিষয়। তবে পাণ্ডুর অনুরোধ রক্ষার্থে, তিনি ক্ষেত্রজ পুত্রের জননী হতে স্বীকৃত হয়েছেন। কুন্তীর ব্যক্তিত্ব যে-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, বোঝা যায়, তিনি কোনো দেবতার সঙ্গে মিলিত হবেন, তা তাঁরই ইচ্ছাধীন। এবং আরও একটি বিষয় আমি দেখছি, কুন্তী যখনই কোনো পুরুষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছেন, সেখানে পাণ্ডুর উপস্থিতি নেই। পাণ্ডুর কোনো ভূমিকাও নেই। তাঁর একটিই মাত্র ভূমিকা। পুত্রটি হবে তাঁর ক্ষেত্রে। পরিচিত হবে তাঁরই সন্তান রূপে।

কর্ণকে বাদ দিলে, কুন্তী এবার দ্বিতীয় সন্তানের জননী হবে। এই সন্তানটি দেখছি, ধর্মের অংশে জন্মেছে। অর্থাৎ, কুন্তী ধর্মকে আহ্বান করে, স্বামীর ক্ষেত্রে, তাঁকে গর্ভবতী করতে অনুরোধ করছেন।

কে এই ধর্ম ?

ইতিহাসের পাতা থেকে ধুলার আস্তরণ সরালেই, এই ধর্মাত্মাকে

আমি দেখতে পাই। যিনি এই ধর্মাত্মাকে জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি সেই ধর্মাত্মার মায়ের গর্ভে তাঁকে উৎপাদন করে বলেছিলেন, "হে কল্যাণি! তোমার গর্ভে যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আসছেন, তিনি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও ধর্মাত্মা হবেন।"

এ ধর্মাত্মা দাসীপুত্র হলেন তাঁর পিতা এক মহৎ ব্যক্তি। তিনি নিজেই তাঁর এই পুত্রের সম্পর্কে আরও বলেছেন, এ পুত্র ধর্মার্থকুশল ধীমান, মেধাবী, মহামতি, সূক্ষ্মদর্শী, স্থিরমতি পুরুষ। এই ধর্মজ্ঞের সময়ে, তাঁর মতো ধর্মজ্ঞ কেউ ছিলেন না। তাঁকে কেউ কখনও অধর্ম আচরণ করতে দেখে নি। কুন্তী এ পুরুষটির প্রতি, একদিক থেকে মনে মনে আসক্ত ছিলেন।

ভীষ্ম এই যুবকের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক যেমন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে শিক্ষিত করেছিলেন। এই ধর্মাত্মা ধনুর্বেদ, গজ-শিক্ষা, নীতিশাস্ত্র এবং ইতিহাস পাঠ, সব বিষয়েই বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন।

এই পুরুষের নাম বিদুর। ইনিই ধর্ম।

আমি জানি, ইতিবৃত্তের প্রচ্ছন্ন ধারাকে যারা বুঝতে অক্ষম, তাদের কাছে ধর্ম যে স্বয়ং বিদুর, এ তত্ত্ব মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু বহু ঘটনার দ্বারাই এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কুন্তীর এই দেবর, বিদুরকে তিনি 'খণ্ডা' বলে সম্বোধন করতেন। শূদ্রা জননীর গর্ভে, ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত সন্তানকে বলা হয় 'পারসব'। পারসব বলেই রাজ্যে বিদুরের কোনো অধিকার ছিল না। পারসব অর্থেই 'খণ্ডা' প্রয়োগ দেখা যায়।

কুন্তীর বিদুরকে হস্তিনায় সংবাদ দিয়ে, শতশৃঙ্গ পর্বতে আহ্বানের ঘটনার পরে, যে-সকল ঘটনা ঘটেছিল, তার কিছু উল্লেখ করলেই সমস্ত বিষয়টির ঐতিহাসিক বাস্তবতা প্রমাণিত হবে।

পাণ্ডবরা যখন দ্রৌপদীসহ দ্বিতীয়বার বনবাসে যায়, তখন কুন্তী

বিদুরের গৃহে ছিলেন। যুধিষ্ঠির নিজেও তাই চেয়েছিলেন। বিধবা রানী কুন্তী সমস্ত বিষয়েই, বিদুরকেই একমাত্র সহায় বলে জানতেন। দুর্যোধন যখন ভীমকে বিষ পান করিয়ে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তখন কুন্তী বিদুরকেই তাঁর অন্তরের ভয় ও সন্দেহের কথা বলেছিলেন। বিদুর কুন্তীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, এ বিষয়ে কুন্তী যেন কারোর সামনে মুখ না খোলেন। কুন্তী যেন মনে রাখেন, স্বয়ং ব্যাসদেব বলেছেন, পাণ্ডবগণ সকলেই দীর্ঘায়ু। ভীম অবশ্যই ফিরে আসবেন।

কুন্তী আপন দুঃখের ও মনের কথা, বিদুর ব্যতীত অন্য কারোকে জানাতে ভরসা পেতেন না।

জতুগৃহের ষড়যন্ত্রের কথা, বিদুরই সাংকেতিক ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যথায়, জতুগৃহে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়ে মরতে হতো।

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে প্রচুর ধনরত্ন ব্যয় হয়েছিল। যুধিষ্ঠির সর্বধর্মবিদ বিদুরকেই ব্যয় বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

দুর্যোধনের দ্বারা দ্রৌপদী লাঞ্ছনায়, একমাত্র বিদুর ব্যতীত আর সকলেই সেই কলঙ্কিত ঘটনার নীরব সাক্ষী ছিলেন। কুন্তী পরে নিজে এ ঘটনার কথা বলেছেন।

পাণ্ডবরা যখন দ্রৌপদীসহ দ্বিতীয়বার বনবাসে যায়, তখন বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, "বৎস যুধিষ্ঠির, ধর্ম বিগর্হিত উপায়ে যদি কেউ বিজিত হয়, তবে, তার ব্যথিত হবার কোনো কারণ নেই। যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হোক। তোমরা আবার ফিরে আসবে। আমি তোমাদের সুখী দেখবো। তুমি ভূমি থেকে ক্ষমা, সূর্যমণ্ডল থেকে তেজ, বায়ু থেকে বল, ভূতসমূহ থেকে সম্পদ লাভ কর।"

পাণ্ডবরা বনগমনের পর ধৃতরাষ্ট্রের কপট কথায় ও আচরণে বিদুর মনের কষ্টে, কাম্যকবনে পাণ্ডবদের কাছে চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য

পরে ধৃতরাষ্ট্র বুঝেছিলেন, বিদুরকে পাণ্ডবপক্ষে থাকতে দিলে, তাঁর ক্ষতি হবে। তাই ক্ষমা চেয়ে ডেকে এনেছিলেন।

বনবাস থেকে ফিরে পাণ্ডবরা যখন পাঁচটি গ্রাম চেয়ে সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "আপনি মহামতি বিদুরকে বলবেন, আমরা তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করছি। বলবেন, যুধিষ্ঠির যুদ্ধ চায় না। তিনি যেন এই সংকটকালে ধৃতরাষ্ট্রকে সুপথে চলার উপদেশ দেন, শান্তির কথা শোনান।"

শান্তির পরামর্শ দিতে সে-সময় কৃষ্ণ হস্তিনায় এসে বিদুরের অতিথি হয়েছিলেন।

কুন্তী নিজে কৃষ্ণকে বিদুর সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন, "সেই দ্যূতক্রীড়ার সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যে আমি একমাত্র বিদুরকে প্রশংসা করি ধর্ম বা বিদ্যার দ্বারা মানুষ আর্য হতে পারে না। চরিত্রেই আর্যত্ব লাভ করা যায়। কৃষ্ণ! সেই মহাবুদ্ধি গম্ভীর মহাত্মা বিদুরের চরিত্রই অলঙ্কার। এবং তা ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।"...

বিদুরের বহু গুণাবলীর বিষয় উল্লেখ করা যায়। কৃষ্ণ থেকে শুরু করে, যাঁরা পাণ্ডবদের ঘোরতর শত্রু তাঁরাও সকলে বিদুরকে মহামতি ধর্মজ্ঞ বলে সম্মান করতেন। সে সব ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করতে গেলে, স্বয়ং বিদুরকে নিয়েই একটি ভারত কাহিনী সৃষ্টি হতে পারে।

কারণ যুদ্ধের পনরো বছর পরে গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর, সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র বনে গমন করলেন। কার্তিকী পূর্ণিমার দিন ছিল তাঁদের যাত্রা। সকলেই কুরুক্ষেত্রে গিয়ে রাজর্ষি শতযুপের আশ্রমে বাস করেছিলেন। যে ধৃতরাষ্ট্রকে এক সময় বিদুর অনেক উপদেশ দিয়েও তাঁকে সৎ পথে ফেরাতে না পেরে কটূ কথা বলেছেন, তাঁর সেবায় ও তপস্যায় বল্কল ও চীরধারী বিদুর অত্যন্ত কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে পাণ্ডবরা সপরিবারে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে

বিদুরকে না দেখে জানতে চাইলেন, তিনি কোথায়? ধৃতরাষ্ট্র বললেন "বিদুর কুশলেই আছেন। তিনি এখন ঘোর তপস্যায় নিরত। আহার বস্ত্রাদি ত্যাগ করে, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে জীবনধারণ করছেন, তাঁর শরীর অতিমাত্রায় কৃশ ও অস্থিচর্মসার হয়েছে।"

যুধিষ্ঠির একা বিদুরের সন্ধানে বের হলেন। গভীর বনের মধ্যে গিয়ে তিনি বিদুরকে দেখতে পেলেন। বিদুর নগ্ন, মলিন এবং বনের ধূলিকণাতে তাঁর দেহ সমাচ্ছন্ন। তাঁকে কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না। তখন যুধিষ্ঠির অরণ্য মধ্যে "আমি তোমার অতি আদরের রাজা যুধিষ্ঠির" চিৎকার করতে করতে বিদুরকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তখন বিদুর এক গাছে হেলান দিয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

বিদুর যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি সংযুক্ত করে, যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠির দেখতে পেলেন গতায়ু বিদুরের শরীর সেই গাছেই ঠেকে আছে। তাঁর দেহে বিদুরের অনুপ্রবেশে, যুধিষ্ঠির নিজেকে অধিকতর বলবান বলে অনুভব করলেন। তিনি বিদুরকে দাহ করবার ব্যবস্থায় রত হলে কে যেন বলে উঠলেন, "রাজা যুধিষ্ঠির, বিদুরের শরীর আগুনে দগ্ধ করো না। বিদুর যতিধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দেহ অগ্নিসংস্কার হবে না। এর জন্য শোক করো না।"

যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরে গিয়ে যখন সব ঘটনা বললেন, তখন সকলেই অত্যন্ত অবাক হলেন। ইতিহাসের এই মহান বৃত্তান্ত থেকে, আমি জানলাম বিদুরের এমন ভাবে তিরোভাবের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এখানেই সেই তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র বলে খ্যাত। বিদুরও ধর্মের অংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছিলেন। এখানে ধর্ম ধর্মে লীন হয়েছে বটে। আমি দেখছি, পিতা পুত্রের দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন।

অতঃপরেও কেউ কেউ কুন্তীর সঙ্গে বিদুরের মিলন, যুধিষ্ঠিরের জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে। ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন সংকেত যারা বুঝতে পারে না, তারা অলৌকিক কিছু ছাড়া জীবনকে ভাবতে পারে না। তারা জ্ঞানকে বিসর্জন দেয়। অজ্ঞতাকে ভক্তিবলে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়।

স্বয়ং মহাভারতকার প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নি, এমন কথা আমি বলতে পারি না। কুন্তীর কন্যকাবস্থায় গর্ভধারণ যে তৎকালীন সমাজে কলঙ্কজনক, যার ফলে, কুন্তীকে সন্তান পালনের গোপন ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, সে-কথাও ঐতিহাসিক ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে ইতিহাসের ওপর যাঁরা কলম চালিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক সমাজের কথা ভেবে, প্রকৃত ঘটনার মধ্যে কতগুলো অলৌকিক কাহিনী আরোপ করেছেন। তাঁরা ভয় পেয়েছেন। কুন্তীর ক্ষেত্রজ পুত্রের কাহিনীর এমন একটা অলৌকিকতা দান করেছেন, যেন ওসব দেবদেবীর ব্যাপার। সাধারণত নরনারীর জীবনে ওসব ঘটতে পারে না।

এ কথা ঠিক, পাণ্ডু যখন কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্র জন্ম দিতে বলেছিলেন সমাজে তখন সেই প্রথা রহিত হয়ে গিয়েছিল। কুন্তীর জীবনের বৈশিষ্ট্যই হলো সংহিতা যুগের নারীর জীবনে যা ঘটতো, তাঁর জীবনে তারই 'পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল'। সেজন্য গোপনীয়তার প্রয়োজন হয়তো ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক সব সময়েই সেই গোপনীয়তার মধ্যে সত্যের একটি সংকেতও দিয়ে রাখেন।

বস্তুতপক্ষে, দুর্বাসা কুন্তীকে অথর্ববেদ থেকে কী মন্ত্র দান করেছিলেন? যে-মন্ত্রের শক্তিতে কুন্তী যে-কোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারতেন, এবং দেবতা তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য থাকতেন? সেই মন্ত্রের মূল যদি কিছু থাকে, তবে তা হলো একটি দৃঢ়তাসূচক উপদেশ। অথবা কুন্তীকে আত্মসচেতন করে তোলাই ছিল দুর্বাসার উদ্দেশ্য। আমি আগেই দেখেছি, দেবতা কোনো আকাশচারী জীব

নন। তাঁরাও মানুষ। তাঁরা দেবতা জাতির মানুষ। তাঁদের বাসস্থান স্বর্গরাজ্য অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। তাঁরা সকলেই স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিলেন। তেমনি ভারতের সমতল ভূমিতে, মানুষ জাতির মধ্যেও অনেক গুণযুক্ত স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিলেন। দুর্বাসা কুন্তীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তোমার রূপ, সততা, ব্যক্তিত্ব, যে-কোনো পুরুষকেই আকর্ষণ করতে সক্ষম। আমার কথা কখনও মিথ্যা হবার নয়।"

আমি দেখেছি, স্বয়ং দুর্বাসার মতো তেজস্বী মহামতি ঋষিই কুন্তীর প্রতি বিশেষভাবে প্রসন্ন, তখন তাঁর তুল্য আরও পুরুষরা কুন্তীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে, এটা স্বাভাবিক। কুন্তীর স্বয়ংবর সভা তা প্রমাণ করেছিল। দেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজন্যবৃন্দ তাঁর মালা পাবার জন্য এসেছিলেন। কুন্তীর জীবনে সেই দিনটি শুভ ছিল না। কুরুরাজ পাণ্ডুকে মাল্যদান করাটা যে ভুল হয়েছিল, পরে তা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন।

কুন্তী যে তাঁর পারসব দেবরটির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে যথার্থ 'ধর্ম' বলে বিশ্বাস করতেন, সে-ঘটনা আমি দেখেছি। পাণ্ডু যখন কুন্তীকে ক্ষেত্রজপুত্র উৎপন্ন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন,এবং কুন্তী সম্মত হয়েছিলেন,তখনই বিদুর তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলেন। এবং শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে, অনুচর দ্বারা তিনি বিদুরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বিদুরকে তিনি সবই খুলে বলেছিলেন। পুত্রার্থিনী হয়ে তিনি বিদুরকে প্রার্থনা করেছিলেন?

বিদুরের মতো নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, কুন্তীর দুঃখের কথা জানতেন। কুন্তীর প্রার্থনা মতো, তিনি তাঁর গর্ভসঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু কুন্তী কি সুখী হতে পেরেছিলেন? কেমন করেই বা পারবেন? একবার দেহদান করাও যা, শতবার করাও তাই এবং বিদুরের প্রতি তাঁর

যতো আকর্ষণই জন্মাক, সেই পারসব দেবরটিকে চিরকালের জন্য নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না। বিদুর বিবাহিত ছিলেন। তা ছাড়া রাজকার্যে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। অতএব কুন্তীর কাছ থেকে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

শতশৃঙ্গের মুনি-ঋষিরা ধর্মজ্ঞ বিদুর সম্পর্কে জানতেন। তাঁরা ভবিষ্যৎ বাণী করলেন, "মহারাজা পাণ্ডুর ক্ষেত্রে, এ পুত্র হবে মহাধার্মিক ও সসাগরা ধরণীর শাসক।"

১৩

যুধিষ্ঠিরের জন্ম-ইতিহাস আমি প্রত্যক্ষ করলাম। কুন্তী ভেবেছিলেন পাণ্ডু একটি পুত্র পেয়েই সুখী হবেন। কারণ তাঁর প্রয়োজন ছিল, নিজের ক্ষেত্রে, সন্তান লাভ করা। কিন্তু আঁতুড়ে যুধিষ্ঠিরকে দেখা মাত্র তাঁর আর একটি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা হলো।

এ ক্ষেত্রে, আমাকে ইতিবৃত্তের পথসন্ধানে নতুন করে যাত্রা করতে হবে। ভারত ইতিহাসের এক আদি অধ্যায়ে দেখছি, পাণ্ডবগণ, পাঁচজন বিভিন্ন ইন্দ্রের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিলেন। এই পাঁচজন ইন্দ্রের মধ্যে প্রথমের নাম বিশ্বভূক। দ্বিতীয় ভূতধামা। তৃতীয় শিবি। চতুর্থ শান্তি। পঞ্চম তেজস্বী।

অথচ আশ্রমবাসিক পর্বে দেখছি, যুধিষ্ঠির ধর্মের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন বায়ু দ্বারা উৎপন্ন হয়েছেন। অর্জুনের ক্ষেত্রে দেখছি অন্য কথা। ইন্দ্রের পরিবর্তে, পুরাতন নর ঋষির দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে। নকুল ও সহদেবকে চিরাচরিত সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারাই উৎপন্ন বলা হয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রের পরিবর্তে অর্জুনের জন্মদাতা পুরাতন ঋষি নর হলেন কেন?

এক আধুনিক ইতিবৃত্তে দেখছি, অগ্নি-পুরাণের বর্ণনায় পঞ্চ-পাণ্ডব উত্তর হিমালয়ের শক জাতীয় ঋষিদের দ্বারা সমুৎপাদিত হয়েছিলেন।

ভারত ইতিহাসেই দেখছি, ঋষি নর ও নারায়ণের আশ্রম গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিত ছিল। পাণ্ডবগণ সেই আশ্রমে মাঝে মাঝে কালাতিপাত করতেন। দেখছি, মহাত্মা নর ও নারায়ণ ঋষি অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান ও মহাপরাক্রমশালী। স্বর্গ বা ব্রহ্মলোকে যখনই

অসুররা আক্রমণ করে অত্যাচার করতো, তখনই এঁরা গন্ধমাদন থেকে সেখানে গিয়ে অসুরদের যুদ্ধে পরাজিত করে বিতাড়িত করতেন। দেবতাদের অশেষ সাহায্য করতেন। অর্জুন, অসুরদের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধে, স্বর্গে গিয়ে, শতসহস্র পৌলমবংশীয় ও কালকঞ্জ-বংশীয় শত্রুদের নিধন করেছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি জম্ভাসুরকেও নিহত করেছিলেন। নারায়ণ মূর্তি কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে খাণ্ডবদাহের সময় বহুতর প্রাণী বধ করেছিলেন। এই কৃষ্ণই সেই নারায়ণ। এই অর্জুনই সেই নর। নারায়ণ ঋষি বহুত্তর গুণে, নর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

সহসা এই নর নারায়ণের কাহিনীটি কেন যে এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, বোঝা যায় না। এটি একটি প্রক্ষিপ্ত ঘটনা বলেই মনে হয়। তবে উত্তর হিমালয়ের শকজাতীয় ঋষিদের দ্বারা পঞ্চপাণ্ডব উৎপন্ন হয়েছিলেন, আধুনিক ঐতিহাসিক বিষয়টির প্রাচীর ইতিবৃত্তের কোনো সংকেত দিতে পারেন নি।

পাঁচজন ইন্দ্রের দ্বারা পঞ্চপাণ্ডব সমুৎপাদিত হয়েছিলেন। ভারত কথার মধ্যে এটিও প্রক্ষিপ্তই মনে হয়। একজন ইন্দ্রের শাসনকাল কম করে, বিশ বছর ধরলেও পাঁচজন ইন্দ্রের শাসনকাল একশো বছর হয়। পাণ্ডবদের জন্ম হয়েছিল চার বছরে। ইতিহাসেই প্রমাণ রয়েছে, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, তিন জনেই, পর পর তিন বছরে জন্মেছিল। চতুর্থ বছরে যমজ নকুল ও সহদেব। অতএব পাঁচজন ইন্দ্রের দ্বারা পাণ্ডবদের জন্মের কথা সত্যি নয়।

যুধিষ্ঠিরের জন্মের পরে, পাণ্ডু আর একটি বলশালী পুত্রোৎপাদনের জন্য কুন্তীকে অনুরোধ করলেন। বলশালী পুত্র উৎপাদনের অনুরোধ করলেন এই কারণে, প্রথম পুত্রটি ধর্মের অংশে জন্মেছে। স্বভাবতই একজন যোদ্ধা বলশালী সন্তানের প্রয়োজন পাণ্ডু অনুভব করলেন।

কুন্তীও পাণ্ডুর অভিপ্রায় মনে মনে অনুমোদন করলেন। এখানে, ইতিবৃত্তের পুরাতনধারাটিকেই অনুসরণ করতে হচ্ছে। শতশৃঙ্গ পর্বতে অনেক বিদ্বান বিচক্ষণ নানা বিদ্যায় পারদর্শী ঋষিরা ছিলেন। তাঁদেরও কুন্তীর প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল।

প্রচলিত উপাখ্যান অনুযায়ী, কুন্তী বলশালী পুত্রের জন্য বায়ুকে আহ্বান করেছিলেন। এবং সেই বায়ু 'মৃগারোহণপূর্বক' আগমন করেছিলেন! মহাবল বায়ুর মতো একজন দেবতা ব্যক্তি হরিণের পিঠে চেপে আসেন কেমন করে?

যেহেতু ক্ষেত্রজপুত্র সেই সময়ে অপ্রচলিত, অতএব জন্মদাতা পিতার পরিচয় গোপন করা হয়েছে। যেমন হয়েছে, পরবর্তীকালেও, দ্রৌপদী আর শিখণ্ডির ক্ষেত্রে। পাণ্ডবদের তো তবু ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়েছে। দ্রৌপদী যেহেতু যজ্ঞস্থল থেকে আবির্ভূত হয়েছিল, সেজন্য তাঁর আর এক নাম যাজ্ঞসেনী।

যাই হোক, আমি কুন্তীর জীবনের বাস্তব ইতিহাসকে অনুসন্ধান করতে চাই। আমি আগেই দেখেছি, ভৌম-স্বর্গলোকে বিভক্ত রাজ্য-গুলোতে এক একজন অধিপতি ছিলেন। বায়ু একজন সেই রকমই স্বর্গলোকের রাজ্যের রাজা। এখানে এসেই ইতিহাসের ধুলাচ্ছন্ন পাতা দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে। শতশৃঙ্গেরই কোনো অমিত বলশালী ঋষিই কি ভীমের পিতা? অথবা, কুন্তী কোনো অনুচরকে স্বর্গলোকে বায়ুর কাছে পাঠিয়ে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন?

কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের জন্মের ইতিহাস অনুযায়ী, সম্ভবতঃ শতশৃঙ্গের কোনো অমিতবলশালী, বিদ্বান ঋষিকেই কুন্তী আহ্বান করেছিলেন। কারণ স্বর্গলোকের পথের যে বর্ণনা পাই, দ্রুতগামী রথে এলেও, অনেকদিন সময় লেগে যাবার কথা। তা ব্যতিরেকে, পথ যে তেমন প্রশস্ত ছিল, এমন নয়। বরং অত্যন্ত দুর্গমই ছিল। অশ্বারোহণে এলেও, অনেক দিন লেগে যেতো। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের জন্মের এক বছর

পরেই ভীমের জন্ম হলো। যুধিষ্ঠিরের জন্মের পর। মাত্র ছ'মাস কিছু-দিন সময় পরেই কুন্তী আবার গর্ভবতী হয়েছিলেন।

অবশ্য অনুচর পাঠিয়ে, বায়ুকে আহ্বান করলে, শতশৃঙ্গ পর্বতে পৌঁছুতে ছ মাস কিছুদিনে হয়তো সম্ভব ছিল। তবে, কুন্তী ইতি-পূর্বে, অপরিচিত অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেন নি। দুর্বাসা বা বিদুর উভয়ের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল। দুর্বাসার সেবা করে-ছিলেন এক বৎসর।

এই প্রচ্ছন্নতার মধ্য দিয়েই, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনেরও সম্ভবতঃ কোনো বিশিষ্ট ঋষিপুরুষের, যিনি ব্রাহ্মণ পরশুরামের মতোই ছিলেন অস্ত্র-বিদ্যাবিশারদ, ঔরসে জন্ম হয়েছিল। কুন্তী যাঁকে শতশৃঙ্গ পর্বতেই দেখেছিলেন। ইন্দ্রকে আহ্বান করার বিষয়টি আমি সম্পূর্ণ কল্পনা জ্ঞানে অস্বীকার করতে চাই না। কেন না, এ কথা সত্যি, কুন্তীর রূপ সততা ব্যক্তিত্ব সকল শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দেবতাকেই আকর্ষণ করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে, পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে, শতশৃঙ্গের ঋষিরা যে ভাবে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রদের হস্তিনায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সংকেত রয়েছে। শতশৃঙ্গে বিদ্বান, ধীর, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ পাণ্ডবদের হস্তিনায় পৌঁছে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

পাণ্ডু যখন (অভিশপ্ত হবার পর ?) শতশৃঙ্গ পর্বতে গিয়েছিলেন তখনই তাঁর মনে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। ইতিবৃত্তে দেখেছি, তিনি এমন সব পুত্র চেয়েছিলেন, যারা সব দিক দিয়েই রাজসিংহাসনে বসবার ও রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত হবে। এ আকাঙ্ক্ষা কি তাঁর মনে আপনা থেকেই এসেছিল ? অথবা শতশৃঙ্গের দূরদ্রষ্টা ঋষিরাই এ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছিলেন ?

শতশৃঙ্গ পর্বতে যখন পাণ্ডবগণের জন্ম হচ্ছিল, হস্তিনায় কি সে-সংবাদ পৌঁছেছিল ? বোধহয় না। ভীম যেদিন জন্মায়, সেই দিনই

দুর্যোধনও জন্মেছিল।

ইতিবৃত্তে একটি বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে, সতেরো দিন ধরে তাঁর ও মাদ্রীর মৃতদেহ কি ঋষিরা হস্তিনায় নিয়ে গিয়েছিলেন? সতেরো দিন কি দুটি মৃতদেহ অবিকৃত, দুর্গন্ধহীন বহনযোগ্য থাকতে পারে? অথবা, ঋষিগণ পাণ্ডু ও মাদ্রীর অস্থিখণ্ড নিয়ে, কুন্তী ও পাণ্ডবগণসহ হস্তিনায় গিয়েছিলেন?

সেটাই স্বাভাবিক। এবং হস্তিনায় ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র বা সাধারণ নাগরিকগণ পাণ্ডবদের জন্মের কোনো কথাই জানতেন না। ঋষিগণের সঙ্গে পাণ্ডবগণ যখন হস্তিনায় গিয়েছিল, তখন যুধিষ্ঠিরের বয়স ১৬। ভীম—১৫। অর্জুন—১৪। নকুল ও সহদেব—১৩। এইসব ক্ষেত্রজ ক্ষত্রিয় পুত্রদের, নিয়মানুযায়ী এগারো বছর বয়সেই উপনয়ন হয়ে গিয়েছিল। পাণ্ডু বেঁচে থাকতে, কেন হস্তিনায় পুত্রদের জন্মের খবর দেওয়া হয় নি, এটি রহস্যময়। কারণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ ও হস্তিনার নাগরিক অধিবাসীবৃন্দ সকলেই সেই দৃশ্য দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন। এমন কি কুরু বংশের পুরুষ ও মহিলারা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

শতশৃঙ্গ পর্বতের একজন প্রধান ঋষি অন্যান্য ঋষিদের অনুমতি নিয়ে পাণ্ডু ও মাদ্রীর বিষয় বলেছিলেন, এবং পাণ্ডবগণের জন্মকাহিনী বিবৃত করেছিলেন।

প্রধান ঋষি যখন সমুদয় বিষয় বলেছিলেন, আর কুরু বংশের রাজ-পুরুষগণ ও মহিলারা অবাক স্তব্ধ হয়ে তা শুনছিলেন, ভীষ্ম তখন উপস্থিত হস্তিনার জনসাধারণের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করছিলেন। লক্ষ্য করে দেখেছিলেন, প্রজাবৃন্দ সকলেই ঋষি-বাক্য বিশ্বাস করছে। তারা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ সন্তানদের কুরুবংশীয় রাজ-অধিকার মেনে নিয়েছিল।

ভীষ্ম তা লক্ষ্য করে, তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি শতশৃঙ্গ

পর্বতের ঋষিদের শুশ্রূষা ও পাদবন্দনার আয়োজন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রহণ করেছিলেন পাণ্ডু ও মাদ্রীর অস্থিখণ্ড। বিদুরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অস্থিখণ্ড দাহ করে, পিণ্ডাদি ও শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে। পাণ্ডবগণকে রাজপুত্রের মর্যাদায় গ্রহণ করে, কুন্তীকে মহারানীরূপে আহ্বান করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, ভীষ্ম ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তকে, তাঁর রাজনীতি জ্ঞানের দ্বারা অতি সাবধানতার সঙ্গে মিটিয়ে দিতে পেরেছিলেন। পাঁচটি পিতৃপরিচয়হীন বালককে নিয়ে ঋষিরা যে-ভাবে এসেছিলেন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারতো, ষোল সতেরো বছরের মধ্যে কেন রাজপরিবারকে এসব জানানো হয় নি। প্রজাবৃন্দের দিকে তাকিয়ে, এবং বিশেষতঃ কুন্তীর ও বিদুরের মুখ দর্শন করে, ঋষিদের বিশ্বাস করাই শ্রেয়, মনে করেছিলেন। তা ব্যতিরেকে, পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রদের গ্রহণে কোনো বাধাও ছিল না।

ইতিবৃত্তের নবদিগন্ত উন্মোচিত হলো।

হয়ে, দাসীদের নির্দেশ দিলেন, শীতল জল এনে সেবনের দ্বারা পরি-চর্যায় মহারানীর সেবা কর।

কুন্তী সংজ্ঞা লাভের পরেও দুই পুত্রকে যুদ্ধোদ্যত দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু অর্জুন রাজপুত্র। সে সূতপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না। এ কথা শোনা মাত্রই, দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান করে, তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন। কর্ণের লজ্জা দূর হলো। আর কুন্তী মনে মনে গভীর আনন্দ পেলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজপুরুষরা অল্পবয়স্ক দুর্যোধনের এই অধিকারবোধ দেখে অবাক হয়েছিলেন। পিতা বা ভীষ্ম বা বিদুর, কারোর সঙ্গে সেই আলোচনা না করে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজা করলেন। আসলে এটি দুর্যোধনের দূরদর্শিতারই লক্ষণ। কর্ণের মতো বীরকে সে চিরকালের মতো বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করে রাখলেন।

ইতিহাসের রথ চললো নানা বাঁকে বাঁকে। পাণ্ডবরা অস্ত্র নৈপুণ্যে যতোই পারদর্শী হয়ে উঠলো, দুর্যোধন ততোই অস্থির হতে লাগলো। অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র কণিককে ডেকে তাঁর কাছ থেকে রাজনীতি ও কূটনীতির উপদেশ চাইলেন। কণিক উপদেশ দিলেন, পাণ্ডবদের বিনষ্টি ছাড়া, কুরু বংশ কখনও নিরাপদ হতে পারবে না। ধৃতরাষ্ট্রের উচিত এখনই পাণ্ডবদের নির্মূল করার পন্থা স্থির করা।

বস্তুতপক্ষে এই কণিকই, ধৃতরাষ্ট্রকে কূট পরামর্শ দিয়েছিলেন, একমাত্র জতুগৃহ তৈরি করে, তার মধ্যে কুন্তীসহ পাণ্ডবদের বাস করার ব্যবস্থার দ্বারা, অগ্নি সংযোগে তাদের হত্যা করতে হবে। কণিক একজন নৃশংস কূটমন্ত্রী, বিদুর তা জানতেন। তিনি দূরে, অলক্ষ্যে থেকে, কণিকের সমস্ত মন্ত্রণাই শুনলেন।

ধৃতরাষ্ট্র নানা ছলে, পাণ্ডবদের কুন্তীসহ বারণাবতে পাঠিয়ে দিলেন। বারণাবত এই সময়ে একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের জন্য যে-জতুগৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল, সে-কথা বিদুরই যুধিষ্ঠিরকে

সংকেত বাক্যে—অর্থাৎ ম্লেচ্ছ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। জতুগৃহ থেকে কীভাবে কুন্তী ও পাণ্ডবরা প্রাণ রক্ষা করে পালিয়ে বেঁচেছিলেন, সে-কাহিনীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কেবল, ইতিবৃত্তিয় একটি বিষয় আমি দেখছি, যা আমাকে নানা নাম ও বিশেষণের কারণ বুঝতে সাহায্য করেছে। সে বিষয়টি হলো এই, যারা বৈদিক ধর্ম-কর্মাদির মহত্ত্ব, ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বান্তঃকরণে নির্বিচারে স্বীকার করতো না, তারা সকলেই আর্য অনার্য নির্বিশেষে দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, গোলাঙ্গুল, ভল্লুক বানর, গরু, পক্ষী, নাগ, অহি, সর্প, ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত হতো। আসলে এরা মানুষই ছিল। এবং তাদের অনেকেরই যথেষ্ট রূপ ও গুণ ছিল।

চার্বাক দরিদ্র ঋষি ব্রাহ্মণ হয়েও নাস্তিক ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদের কাজ বিশেষকে তীব্র সমালোচনা করতেন, ভণ্ড ও চতুর বলতেন। এই গুরুতর অপরাধের জন্য, বৈদিক ধর্মাবলম্বীগণ তাঁকে 'রাক্ষস' আখ্যা দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

রাক্ষস হিড়ম্বও সেই রকমই একজন মানুষ। তবে তার চরিত্রের মধ্যে একটা পশুত্ব ছিল। হিড়িম্বা ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। ভীম যায় নি। সে হিড়িম্বাকে বধ করেছিল। আর হিড়িম্বাকে দেখে, কুন্তী মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন, 'সুন্দরি, তুমি কে ? হে বরবর্ণিনি ! তুমি কার ভার্যা?···তুমি যদি এ বনের দেবতা বা অপ্সরা হও, তবে কেন এখানে অবস্থান করছো আমাকে বল।'

হিড়িম্বা নিজের পরিচয় দিয়েছিল, এবং সে যে ভীমের প্রতি আসক্ত তাও ব্যক্ত করেছিল। কুন্তী নিজে ভীমকে হিড়িম্বার পাণিগ্রহণের নির্দেশ দেন। কুন্তী নিজে জানতেন, একজন রমণী অপাপবিদ্ধা কেন ভীমের মতো বীরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

একচক্রা নগরীতে কুন্তী পাঁচ পুত্রসহ এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতে গেলেন। নরমাংসভোজী বক রাক্ষসের কাহিনীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দেখি না। বক নরমাংসভোজী রাক্ষস হতে পারে। কিন্তু সে রোজ দুটো মহিষ, তণ্ডুলাদিসহ একটি মানুষকে খেয়ে ফেলতো, এটা অতিশয়োক্তি ও অবিশ্বাস্য। একচক্রা নগরীর কাছেই বেত্রকীয়-গৃহ নামে স্থানের রাজার একচক্রা শাসন করার কথা। কিন্তু রাজাটি নির্বোধ, দুর্বল, প্রজারক্ষায় অক্ষম। এই সুযোগেই, বক প্রজাদের কাছ থেকে, প্রতিদিনই যা আদায় করতো, সবই তার সম্পত্তি ও ক্রীতদাস হতো। মহিষগুলোর মধ্যে হয়তো সে কখনও কখনও একটি বধ করে, সপরিবারে খেতো। তণ্ডুলাদি তো খাদ্যই ছিল। আর মানুষ হয়তো সে কালেভদ্রে ভোজন করতো। নরমাংসভোজী থাকাটা সেকালে কিছুই আশ্চর্যের ছিল না।

পাণ্ডবরা যে-ব্রাহ্মণের বাড়িতে বাস করতো, হঠাৎ একদিন তাদের পালা পড়লো, বক রাক্ষসের প্রাপ্য মেটাতে হবে। কুন্তী ও পাণ্ডবরাও সেখানে ব্রাহ্মণ বলেই পরিচিত ছিল। তবু কুন্তী ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁকে বা তাঁর পুত্রকে বকের কাছে যেতে হবে না। তিনিই যা ব্যবস্থা করার করবেন।

কুন্তী বকের কাছে ভীমকে যাবার নির্দেশ দিলেন। যুধিষ্ঠিরের মনে হলো, মা এ কাজটি ঠিক করলেন না। নিজের পুত্রের জীবন বিসর্জন দিয়ে, অপরকে বাঁচানোর জন্যই কি তারা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে? মা এ কথা বুঝলেন না?

কুন্তী বললেন, "আমি জানি, ভীমই বককে হত্যা করতে পারবে। আমাদের উচিত, আশ্রয়দাতার জীবন রক্ষা করা। আমি পাঁচ পুত্রের একজনকে পাঠাচ্ছি কিন্তু আমার মনে যথেষ্ট সাহস ও ভরসা আছে।"

কুন্তী যে আশ্রয়দাতার উপকারার্থেই শুধু সেই সিদ্ধান্ত নিলেন,

তা নয়। বকের মতো একজন রাক্ষস ব্যক্তিকে হত্যা করা, জনসমাজেরও প্রয়োজন। নিজের প্রিয় পুত্রের জীবন বিপন্ন বোধ করেও তিনি সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেন নি।

দ্রৌপদী সম্পর্কে ভিক্ষালব্ধ পাঁচ ভাইয়ের যে-গল্প তৈরি হয়েছে, তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কুন্তী না জেনে, এমন কথা বলেন নি, ভিক্ষা করে যা পেয়েছো, পাঁচভাই তা সমান ভাগে ভাগ করে নাও। কারণ, দ্রুপদ গৃহে গিয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করা ও পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, এ সবই বেদব্যাস আগেই ব্যাখ্যাসহ কুন্তী ও পাণ্ডবদের কাছে বিবৃত করেছেন।

কুন্তী যে পাঁচ পুত্রের এক স্ত্রী গ্রহণ করাকে সমর্থন করেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর দূরদৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পাঁচ পুত্রের মুখ দর্শনেই বুঝেছিলেন, সকলেই দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ, ও তাঁর পাণিপ্রার্থী। যদি তিনি সেদিন ঘটনাটি সমর্থন না করতেন, তা হলে পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো।

যুধিষ্ঠির অতি ধার্মিক ও সৎ হওয়া সত্ত্বেও, তার দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তি কুন্তীকে মনে মনে কষ্ট দিতো। শেষ পর্যন্ত যখন দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে, আবার পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ বনবাসে গমন করলেন, তখন তিনিও সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। বিদুর যেতে দেন নি। কুন্তী বিদুরের গৃহে ছিলেন ও বনযাত্রাকালে কুন্তী দ্রৌপদীকে বিশেষ করে কেবল সহদেবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, সহদেব সর্বকনিষ্ঠ, এবং কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তার কম। এতে বোঝা যায়, কুন্তী কখনও তাঁর স্বাভাবিক ও ন্যায় বুদ্ধি মুহূর্তের জন্যও হারান নি।

কুন্তী কৃষ্ণকে তাঁর মনস্তাপের কথা এমন ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, কৃষ্ণ তখন থেকেই পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কৃষ্ণ যখন শান্তির জন্য দুর্যোধনকে শেষ পর্যন্ত সম্মত করাতে পারেন

নি, তখন কুন্তীকে এসে সে-কথা বলেছিলেন। এবং জানতে চেয়েছিলেন, এবার যুধিষ্ঠিরকে তিনি কী বলবেন?

কুন্তীর জবাবে বলেছিলেন, তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলবে, তার ধর্ম ক্ষীণ হচ্ছে। আমি তার মা হয়ে পরগৃহবাসিনী। আমাকে ধিক্! তুমি ভীম অর্জুনকে বলবে, তাদের ক্ষত্রিয়ের পরীক্ষাকাল উপস্থিত হয়েছে। তারা যদি এ সময় বৃথা নষ্ট করে, তবে আমি তাদের মুখ দেখতে চাই না। প্রাণের ভয় না করে, তারা যেন প্রাণ দেওয়াটাই শ্রেয় বোধ করে। নকুল সহদেবকেও এ কথাই বলবে।

'কৃষ্ণ, তুমি যুধিষ্ঠিরকে আরও বলবে, তার বুদ্ধি ক্ষত্রিয়োচিত নয়। ক্ষত্রিয় সন্তান বাহুবলে পৃথিবী জয় করবে, ধর্মপথে থেকে প্রজা পালন করবে। আমি জ্ঞানবৃদ্ধদের মুখে শুনেছি, একসময় কুবের রাজর্ষি মুচুকুন্দকে সমগ্র পৃথিবী দান করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই করেছিলেন। যুধিষ্ঠির যেন এসব কথা স্মরণ রেখে, পৈতৃক রাজ্য যুদ্ধের দ্বারা উদ্ধার করে,এই আমার আদেশ।'

'কৃষ্ণ। তোমাকে আমি এক ঐতিহাসিক ঘটনা জানাই। বিদুলা নামে এক তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়রমণী ছিলেন। সেই বিদুষী বুদ্ধিমতী মহিলার পুত্রের নাম ছিল সঞ্জয়। সঞ্জয় সিন্ধুরাজের নিকট পরাজিত হয়ে, কাপুরুষের মতো উদ্যমহীন জীবন কাটাচ্ছিলেন। তখন বিদুলা পুত্রকে বলেছিলেন, তুমি শত্রু হাসিয়ে, ঘরে কী করছো। আমি কি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নি? তোমার পিতা কি ক্ষত্রিয় ছিলেন না? ওরে কাপুরুষ, ওঠ। পরাজয় নিয়ে শুয়ে থাকিস না। কাপুরুষই একমাত্র অল্পেতে তুষ্ট থাকে। সাপের দাঁত তুলতে গিয়ে মরাও ভালো, তবু কুকুরের মতো বেঁচে থাকা উচিত নয়। গাব গাছের অঙ্গার যেমন হঠাৎ সামান্য ক্ষণ জ্বলেই নিভে যায়, তুই সেই রকম একটু সময় বীরত্ব দেখিয়ে নিহত হ। তুঁষের মতো ধোঁয়া বের করে বেঁচে থেকে লাভ কী? গাধার মতো নিস্তেজ পুত্র কি

ক্ষত্রিয়ের বংশ-ধারা রক্ষা করতে পারে ! যা, হয় বীরত্ব দেখা নয় মৃত্যু বরণ কর। "বিদুলার কথায় সঞ্জয়ের প্রাণে ক্ষাত্রধর্ম জেগে উঠেছিল, সে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। কেশব ! তুমি আমার পুত্রদের এ কাহিনী শুনিয়ে বলবে, ক্ষত্রিয় সন্তান কখনও যুদ্ধকে ভয় করে না। আমার ছেলেরা যেন দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা ভুলে না যায়।'

কৃষ্ণের মুখে কুন্তীর এসব কথা শুনে কেবল পাণ্ডবরা অবাক হয় নি। ভীষ্ম তখন দ্রোণ দুর্যোধনকে ডেকে বলেছিলেন, 'মায়ের এই, অত্যুগ্র উপদেশ শুনে, পাণ্ডবরা তাদের রাজ্যাংশ না পেলে শান্ত হবে না।'

বিদুর দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের মনের কথা কুন্তীকে জানালেন, 'যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু ভীষ্ম বা দ্রোণ স্নেহবশতঃ পাণ্ডবদের বিশেষ ক্ষতি করবেন না। একমাত্র পাপমতি কর্ণ দুর্যোধনের সমর্থক। সে অতি বলবান। পাণ্ডবদের ক্ষতি করতে সে সক্ষম, এবং তাদের সে অতি মাত্রায় দ্বেষ করে।'

কুন্তী তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং কর্ণের কাছে গমন করলেন। কর্ণকে তার জন্মবৃত্তান্ত সব শুনিয়ে বললেন, 'তুমি পার্থ। তুমি দুর্যোধনকে ত্যাগ কর। নিজের ভাইদের সঙ্গে যোগ দাও।'

এ ইতিহাস সকলেরই জানা। কর্ণ কুন্তীকে নানা ভাষায় অভিযুক্ত করলেন। ধিক্কারও দিলেন, 'তুমি আজ তোমার পুত্রদের জীবন রক্ষার্থেই আমার কাছে এসেছো। কিন্তু আমি দুর্যোধনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি কৌরব পক্ষে থেকে যুদ্ধ করবো। তবে তোমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য একটি প্রতিজ্ঞা করছি। অর্জুন ভিন্ন তোমার আর চারি পুত্রকে সুযোগ পেলেও হত্যা করবো না। কিন্তু অর্জুনকে রেহাই দেবো না। যদি অর্জুন নিহত হয়, তাহলেও তুমি পাঁচ

পুত্রের জননী থাকবে? আমি নিহত হলেও তুমি পাঁচ পুত্ররই জননী থাকবে।"

কর্ণের উচিত কথা শুনে, কুন্তী কাঁপতে কাঁপতে পুত্রকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিয়ে চলে এলেন।

১৫

যুদ্ধ শেষ! কেবল চারদিকে কান্নার রোল আর স্তূপীকৃত মৃতদেহ সর্বত্র ছড়ানো। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে, বিদুর সমস্ত মৃতদেহের দাহ-কার্য সমর্পণ করলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মুখে রেখে, নারী পুরুষ সকলে গঙ্গায় উপস্থিত হলেন। সকলেই যুদ্ধে নিহত আপন-জনদের উদ্দেশে সলিলাঞ্জলি দান করলেন।

কুন্তী এ সময়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কেঁদে উঠে, সকলের সামনেই বলে উঠলেন, "ওরে আমার বৎসগণ! যে-মহাবীরকে তোমরা রাধাতনয় বলে জানতে, যে-সত্যসন্ধ বীর্যবান দুর্যোধনের সহায়ক ছিলেন, অর্জুনের দ্বারা যিনি নিহত হয়েছেন, সেই পুণ্যকর্মা কর্ণ তোমাদেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি সূর্যসম পিতা কর্তৃক আমার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। তোমরা তাঁর উদ্দেশ্যেও তর্পণ কর।"

সেই শোকবাক্য শুনে, সকলের থেকে বেশি পাণ্ডবরাই বিস্মিত ও শোকমগ্ন হলেন। বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরের শোক যেন শত গুণে বর্ধিত হলো। মাকে তিরস্কার করে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কর্ণের উদ্দেশে সলিলাঞ্জলি দিয়ে তিনি অভিশাপ দিলেন—"আজ থেকে স্ত্রীলোকগণ কোনো কথাই মনে গোপন রাখতে পারবেন না।"

ইতিহাসের এটাই বিস্ময়, এবং কুন্তী চরিত্রেরও। তিনি যে-কথা বহু কাল গোপন করেছিলেন, আজ তা প্রকাশ করলেন সর্ব সমক্ষে। এখানেই তিনি মহৎ মহিয়সী।

অতঃপর যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু কুন্তীর মনে কিছুমাত্র আনন্দ নেই। নিজ পুত্রকে রাজা দেখেও, তাঁর অন্তরের

বিষাদ দূর হলো না। তিনি গান্ধারীর সেবায় কোনোক্রমে দিন কাটিয়ে পনরো বছর অতিক্রম করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী, যুধিষ্ঠিরের শত অনুরোধ সত্ত্বেও বাণপ্রস্থে গমন করলেন। কুন্তী গান্ধারীর হাত টেনে নিজের কাঁধে রাখলেন। গান্ধারীর কাঁধে ধৃতরাষ্ট্রের হাত। কুন্তী সকলের আগে। পিছনে সমস্ত পুত্রগণ, পুত্রবধূগণ চলেছেন। কার্তিকের পূর্ণিমা তিথিতে, হস্তিনার বর্ধমান-দ্বার দিয়ে তাঁরা যাত্রা করেছেন। পিছনে পিছনে অগণিত শোকমগ্ন নরনারী।

কুন্তী যে বাণপ্রস্থে চলে যাচ্ছেন, কেউ তা বুঝতে পারেন নি। কিছু দূরে এগিয়ে যুধিষ্ঠির কুন্তীকে বললেন, "মা, আপনি গৃহবধূদের নিয়ে ফিরে যান। আমি এঁদের সঙ্গে আরও একটু এগিয়ে যাই।"

কুন্তী জবাবে বললেন, "সহদেবকে সর্বদা সস্নেহে রক্ষা করবে। সে তোমার ও আমার একান্ত অনুরক্ত। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সূর্যতনয়, যাঁর পরিচয় আমি এতকাল গোপন করেছিলাম, তাঁকে স্মরণ করে আমার প্রাণ অপরাধবোধে বিদীর্ণ হচ্ছে। তোমরা তাঁর নামে দক্ষিণাদি দিও। আমি ভাসুর ও ভাসুর পত্নীর সেবায় তপস্বিনী হয়ে বসবাস করবো।"

এ কথা শুনে পাণ্ডবরা শোকে ভেঙে পড়লেন। বললেন, "আপনি চলেই যদি যাবেন, তবে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বিদুলার কথা শুনিয়ে আমাদের পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আদেশ কেন দিয়েছিলেন?"

কুন্তী চোখের জল মুছে বললেন, "তোমরা ক্ষত্রিয় পুত্রগণ শত্রু-পরাভূত হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে, এই ভেবে আমার দুঃখ হতো। এই জন্যই, তোমাদের ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ করেছি, রাজ্য উদ্ধারের প্ররোচনা দিয়েছি। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধের জন্য তোমাদের উত্তেজিত করেছি।...শোন, আমি স্বামীর ঐশ্বর্য ভোগ করেছি, স্বামীর ধন দান করেছি, যথাবিধি সোমরসপান করেছি।

নিজের ভোগের জন্য আমি বিদুলার কাহিনী শোনাই নি। তোমাদের রক্ষা করার জন্যই শুনিয়েছি।…আরও শোন, তোমার বিজিত রাজ্যে ঐশ্বর্য ভোগের স্পৃহা আমার নেই। কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তুমি সবাইকে নিয়ে ফিরে যাও। ধর্মে তোমার মতি স্থির থাকুক। তোমার অন্তর মহৎ হোক।"

অরণ্যে কাল কাটছে। যুধিষ্ঠির সবাইকে দর্শন করবার জন্য অরণ্যে গমন করলেন। এই সময়ে বিদুরের মহাপ্রয়াণ ঘটলো যুধিষ্ঠিরের সামনেই।

যে-মহাপ্রয়াণের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা বিদুরের ঔরসজাত পুত্র ছিলেন!

ব্যাসদেবও এলেন। তপস্বিনী কুন্তী তাঁকে বললেন, "ভগবন, নিতান্ত মন্দবুদ্ধিবশতঃ আমি আমার কন্যাকাবস্থার সন্তানটিকে নদীপথে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। সে কথা মনে করে, আমার অন্তর পুড়ে যাচ্ছে। এ পাপ না অপাপ, জানি না, আপনার কাছে অকপটে স্বীকার করি, দুর্বাসার বরেই আমার সব লাভ হয়েছে। এখন আমি আমার সেই পুত্রটিকে একবার দেখতে চাই। একবার তাকে দেখান।"

ব্যাসদেব বললেন, "তোমার স্বীকারোক্তি ও চরিত্রই তোমার সমস্ত অপরাধ ধুয়ে দিয়েছে। কোনো পাপই তোমার নেই।"

তারপরে তিনি যোগবলে মৃতদের সবাইকে দেখালেন। পাণ্ডবরা অনেক চেষ্টা করেও ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী ও কুন্তীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না।

এ ঘটনার, একবছর পরে, নারদ হস্তিনায় আগমন করলেন। তাঁর কাছেই জানা গেল, গঙ্গাদ্বারের (অধুনা হরিদ্বার) কাছে এক মহারণ্যে, দাবানলে প্রাণ আহুতি দিয়েছেন। তিনি সঞ্জয়ের মুখে

এই বৃত্তান্ত শুনেছেন সেই দাবানলে দগ্ধ বনে গিয়ে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তীর দগ্ধ দেহ দেখে এসেছেন।

আমি দেখছি, ইতিহাসের পাতায়, কী ঐশ্বর্যময়ী রমণী চিত্র অঙ্কিত। সারা জীবনের দুঃখের মধ্যেও যিনি ভেঙে পড়েন নি, এবং যোগাসনে বসে দাবানলে প্রাণ ত্যাগ করছেন। পৃথার জীবন যেন সমস্ত সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে। যিনি প্রেম কী তা জেনেছেন। কিন্তু সারা জীবন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে, তাঁর পাপবোধ, বিশ্বের সকল মানবীকে নতুন চেতনা দিয়েছে।

পৃথা ! তুমি আমাদের সকলের প্রণাম নাও।